ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

মায়াবতী

[১৯৫২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত]

॥ অনুবাদ ॥
শিশির সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২ ॥

এই লেখকদের অন্যান্য বই

॥ প্রবন্ধ ॥

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

॥ অনুবাদ ॥

জোহান বয়ারের —গ্রেট হাঙ্গার

—পাওয়ার অফ্ এ লাই

রোমানফের —কিসলিয়াকফ

জেন্ অস্টেনের —দর্পিতা

—কন্যাকাহিনী

চার্লস ডিকেন্সের —দুই নগরের গল্প

ন্যাথানিয়েল হথর্নের—মৃগতৃষ্ণা

শিশির সেনগুপ্তের উপন্যাস

সূর্য তপস্যা

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর

পিনোসিয়ো

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—



ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

'আজ দু' বার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলে তুমি।'

শুনে অসহিষ্ণু দোলা দিয়ে এক দিকের কাঁধটা একটু উঁচু করলে মেরী।

'ঠিক মুখ ফেরায়নি। না না, ঠিক মুখ ফেরান যাকে বলে তাই করেছিলে নাকি ?'

কথা হচ্ছিল মায়ের সঙ্গে মেয়ের গভর্নেসের।

এমন সময় বেজে উঠল গীর্জার ঘণ্টা। মেয়ের মায়ের প্রশ্নের জবাব দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল গভর্নেস আগাথা। ঘরে ফেরা অনেক পরিবারের সঙ্গে মেরীর মা-বাবাও মিলে-মিশে এগিয়ে আসছিলেন। কারুর সঙ্গেই খুব মাখামাখি গলাগলি নেই এদের। তবে মুখের মিষ্টি হাসিটি ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে সকলের জন্যে। লোকে বলাবলি করে উপাসনার শেষে জুলিয়া দুবের্নে যেমন মুখের ভাবটি নিয়ে বেরিয়ে আসেন গীর্জা থেকে তেমন আর কেউ নেই এ শহরে।

কার সঙ্গে কতটুকু ওজন মেপে কথা বলতে হয়, কা'কে কতখানি আপ্যায়িত করতে হয় তার চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানে না। কিন্তু সে ঐ অবধি। সব মাপা-জোপা।

ছিমছাম গড়নের মেয়েমানুষ। ঐ বয়সের অন্য মেয়েদের তুলনায় স্ফীত উদরের আয়তনটি একটু বড়ো বলে মহিলাকে বেশ রানী-রানী দেখায়। তা নিয়েও এখানে কানাকানি হয়। পেটের ভিতর কি জন্মাচ্ছে কে জানে ?

—'ও মা, মাদাম মঁজি হাত নেড়ে ডাকছেন আমাদের দেখো না'—বললে মেরী।

—'চলে আয়'—দাঁতে দাঁত পিষে নীচু হয়ে হিস্-হিস্ শব্দ করলেন মা—'ওরা আর্বিবাদের সঙ্গে রয়েছে। আর্বিবাদের সঙ্গে আলাপ করার মোটে অভিরুচি নেই আমার।'

মাথার ওপর জলন্ত ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। এরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

কত যুগ ধরে নিজের ভার বয়ে বয়ে ধনুকের মত বেঁকে নুয়ে পড়েছে বাড়িটা। রাস্তার ধারে বাড়ি। জানলা-শার্সি বন্ধ। যেন এখনি শত্রু আক্রমণ করবে, এই ভয়ে ঘর ঘর সন্ত্রস্ত লোকজন। হুড়মুড় করে হুমড়ি খাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় গায়ে গায়ে যেন জড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। ছড়ান ময়লার গাদার চারি পাশে মাছিদের অবিরাম ভনভনানি চলেছে। সদর রাস্তায় সবার চোখের ওপর তিনটে কুকুর মিলে একটা মেয়ে-কুকুরের গা শুঁকে শুঁকে ফিরছে। মেয়ে-কুকুরটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোন হুঁশই নেই।

অনেক পথ ভেঙে তারা ছায়াশীতল পথে এসে পৌছল। রোদের গনগনে চুল্লীর ভিতর দিয়ে আসার পর এই স্নিগ্ধ শীতল ছায়া যেন দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে হতে লাগল। ময়রার দোকান ছাড়া আর সব দোকানের ঝাঁপ ফেলা।

রবিবারে মেরীর বাঁধা-বরাদ্দ মিষ্টি খাওয়া। 'খেতে বসেই মেয়ের অমনি মিষ্টির থালার দিকে চোখ'—মায়ের নিয়মিত বকুনি মনে পড়ল মেরীর। কিন্তু আজ আর নয়। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটল।

—'পা চালিয়ে চল মেরী, থামিস্‌নি। আগাথা বরং কিনে নিয়ে যাবেখ'ন। আর্বিবারা যদি দেখে আমরা ময়রার দোকানে ঢুকেছি তাহলে মাছির মত ছেঁকে ধরবে আমাদের। আগাথা, যদি কিছু মনে না কর আমরা এগোই। তুমি মিঠাই কিনে পিছনে এস।'

আগাথা এদের দল-ছাড়া হয়ে বিচ্ছিন্ন হল। কার্লাদের ঘরের

মেয়ে সে। তবু মাদামকে খুশী করতে পারার আগ্রহ তার কিছুমাত্র কম নয়। মাদাম যখনই আগাথাকে কিছু করতে বলেন,—যতই মাইনে-করা লোক হোক না কেন—সে যে কাঁর্ল্লাঁদের ঘরের মেয়ে এ কথাটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। বংশমর্যাদায় আগাথা তার চেয়ে অনেক বড়। এ চিন্তায় মনে যতই আত্মতৃপ্তি হোক না কেন, একটু অনুকম্পাও হয় মেয়েটার প্রতি।

আগাথার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন পরিপাটি জামার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসা হাড়-জিরজিরে গলা, পাতলা চুল। তাকিয়ে দেখেন তার পাতলা জামার দিকে—শরীরের কোন কিছুকেই যা ঢেকে রাখতে পারেনি। হোক না পাখির মত হাড়গিলে মেয়েটা। কিন্তু বংশ-কৌলীন্য যাবে কোথায়? সে কি কম জিনিস নাকি?

শেষ অবধি বাড়ির হলঘরে এসে উঠল সবাই। এ ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালে নোনা-লাগা। এক তলায় সারি সারি অনেকগুলি অফিস-ঘর। মেরীর বাবা আঁর্মা দুবের্নে তেজারতী ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে সেগুলি খালিই পড়ে আছে। মেরীর মা বলেন—'ঘরগুলো রয়েছে—ওঁর কোন একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে। ভগবানের অশেষ করুণা, মেরীর বাবার হাতে যা আছে তাতে ওঁর রোজগারের জন্যে কোন কাজ করার দরকার নেই।'

বেশ চলেছিল স্বল্প পুঁজির কাজ-কারবার। দিনে দিনে আয়ের অঙ্ক স্ফীত হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে যে এসে জুটল ঐ সুদের অফিসের বিরাট হাঙ্গরগুলো। সুদ-আসলের নিস্তরঙ্গ জলে ঘটিয়ে দিল বিপর্যয়। কাজ-কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন মেরীর বাবা। স্বামী যে ঐ সুদের অফিসের খপ্পরে পড়ে উদরসাৎ হয়ে যায়নি এই

একটি মাত্র কারণে স্বামীর বৈষয়িক বুদ্ধির উপর মাদামের অবিচল নিষ্ঠা।

সিঁড়িটা চির-অন্ধকার। কিন্তু সিঁড়ির চাতাল থেকে দোতলার ঘরগুলোর দিকে যেতে দুপুরের চোখ-ধাঁধান রোদ থেকে হঠাৎ ছায়ায় আসার মতই মনে হয়। ঘরের ভেতর আবছা আবছা শুধু চোখে পড়ে বিছানার সাদা চাদরগুলো। অবশ্য এ অন্ধকারে অসুবিধে কিছু নেই। এখানকার মানুষ সব পেঁচার মত। মা মেয়ে বড় ছোট সবারই এ অন্ধকার গা সওয়া। দোর্থেতে যারা থাকে সূর্যের আলো আর মাছির সঙ্গে তাদের চিরদিনের আড়াআড়ি। ও সব বাইরের। বাড়ির ভেতরে তাদের কোন অধিকার নেই। বসন্ত কালের পর থেকেই এ শহরের বাড়িতে বাড়িতে লোকে আধা-অন্ধকারের রাজ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেয়।

ড্রয়িংরুমের মধ্যে মস্ত একটি চেয়ারে আরাম করে চেপে বসেছিলেন মেরীর বাবা। তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত একটি রশ্মিশর জানালার কাচ দিয়ে এসে পড়েছে তাঁর মাথায়। সেই আলোর রেখা-পথে অগণিত উজ্জ্বল ধূলিকণার নৃত্যলীলা চলেছে অবিরাম।

—'আজ উপাসনা শেষ হতে বেশ দেরি হয়েছে দেখছি।'

—'নিজে গেলে কিন্তু এত বেলা হয়েছে বুঝতে পারতে না।'

একটু আগে মেয়ে যেমন কাঁধ নাড়া দিয়েছিল এখন তিনিও তেমনি এক দিকের কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে উঁচু করলেন। এখুনি যা হোক একটা কিছু কথা পাড়তে হবে। না বললে মেরীর মা তার চিরকেলে পুরোনো প্রসঙ্গ অবতারণা করে বসবে। সেই এক প্যান-প্যানানি। কে যে কখন মরবে তার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। এই ধর না কেন মাংসওয়ালার কথা। লোকটা আচার্য মশাইকে বলেই রেখেছিল যে, ঠিক সময়টিতে সে ডেকে পাঠাবে তাঁকে। কিন্তু তা

করার আর তর সইল না। এক বোঝা পাপ নিয়ে সরে যেতে হল লোকটিকে পৃথিবী থেকে।

এই সব কথা ভেবেই মেরীর বাবা তাড়াতাড়ি জানতে চাইলেন, গীর্জায় খুব ভিড় হয়েছিল কি না।

বাপের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়ে বসেছে মেয়ে। মেরীর মা আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে সযত্নে টুপি ও কেশপাশ থেকে পিন খুলতে ব্যস্ত।

—'বললে তোমার বিশ্বাস হবে না—গীর্জা থেকে আমরা বেরিয়ে আসার সময় দেখি কি মঁজিরা আর্বিবাদের সঙ্গে আলাপে উন্মত্ত। উপায় ছিল না ওদের চেনা না দিয়ে। নমস্কার জানাতে হল। সে যে কী বিরক্তিকর ব্যাপার! আর্বিবারা নিশ্চয় ভাবলে যে, আমরা বুঝি ওদের খুব খাতির করে নমস্কার করলাম।'

—'ময়রার দোকানে ভাল কিছু পেলে নাকি?'

—'ঐ আর্বিবাদের ভয়ে ঢুকিনি সেখানে। আগাথা আচার নিয়ে আসবে।'

—'আজ তোমার কি হবে মা? খেতে বসে মিষ্টি না পেলে তোমার যে মুখে অন্ন রুচবে না'—মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আশ্চর্য নরম হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

—'ওর কথা আর বলো না। আজ উপাসনার সময় দু' দু'বার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল তোমার মেয়ে।'

মেরীর দুই চোখের তটে অশ্রু ছলছল করে উঠল। বললে—'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ মা, যেন গীর্জায় পিছন ফিরে তাকান কী একটা মস্ত অপরাধ।'

—'আমার সঙ্গে আর ভণ্ড ভালোমানুষী করতে হবে না। অমন করে বিশেষ কারুর দিকে তাকানোর মানে কি, তা বোঝবার ঢের

বয়েস হয়েছে তোমার। এ নিয়ে যে এতক্ষণ ঢী-ঢী পড়ে গেছে চারি দিকে সে আমি খুব ভালই বুঝতে পারছি।'

—'সে ছিল সেখানে?'

মেরীর বাবার কথা লুফে নিয়ে মা রাগত স্বরে বললেন—'ছিল না আবার? ছিল বই কি। প্রাণের বন্ধু প্লাসাদের ছেলেটাও সঙ্গে ছিল যথারীতি।'

বাবা মার কথা শুনে এতক্ষণ মেরী জানালার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শার্সির কাচে কপাল চেপে দাঁড়িয়ে দেখছিল নিজের মুখের তামাটে প্রতিবিম্ব। মায়ের তিরস্কারে কান্নায় ভেঙে পড়ল অভিমানিনী। ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

'হল ত?'—রাগে গর-গর করতে লাগলেন মেরীর বাবা—'আজকে খাওয়ার দফা শেষ। আজকে চিংড়ি মাছ এসেছে। জান ত, চিংড়ি মাছ খেতে কত ভালবাসে তোমার মেয়ে?'

—'চিংড়ি মাছ তোমার পেটের পক্ষে কত খারাপ সে ত মনেই রাখ না।'

—'তিলকে তাল করা তোমার চিরদিনের স্বভাব। মেয়েটাকে কি নাস্তানাবুদ করে কাঁদালে মিছিমিছি।'

—'মিছিমিছি? এটা সামান্য ব্যাপার ভাব বুঝি তুমি?'

—'হাজার হোক ও সালোঁদের ঘরের ছেলে। আর এই সময়টা ডাঃ সালোঁর সঙ্গে সেই ডিলটা শেষ হব হব হয়েছে। ঐ জমি আর বাড়িটা সস্তায়—'

—'কিছুতে না। আমি বেঁচে থাকতে সে কিছুতে হতে দেব না। কখনো না—কিছুতে না—'

হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল আগাথা। আচার নিয়ে এসেছে বাজার থেকে। আধো-অন্ধকার ঘরে বাদাম তেলের গন্ধ

এসে নাকে লাগল। মেরীর বাবা চেয়ার থেকে উঠে নিজে প্যাকেটটা নিলেন ওর হাত থেকে।

—'মেরী কোথায়?'

—'নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে—' বললেন মা—'গীর্জায় দু'বার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল সে কথা ওর বাপকে বলে দিয়েছি বলে বাপ-সোহাগীর মান হয়েছে।'

মেরীকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল আগাথা কিন্তু বাধা দিলেন মেরীর বাবা। বললেন—'দরকার নেই এখন ডেকে। বরং খেতে বসে পড়াই ভাল। মেয়ের মেজাজ শান্ত হতে এখন এক যুগ। ততক্ষণে মাংস ওদিকে গলে বসে থাকবে।'

—'ওঁর তৈরী করতেও ত একটু দেরি আছে।'

—'তা হোক বাপু। মাংস হতে হতে চিংড়ি মাছ নিয়ে বসে পড়া যাক তো ততক্ষণ।'

॥ ২ ॥

মেরীর ঘর আর ছাত। মাঝে নীচু একটা চিলেকোঠা। গীর্জায় যাবার আগে ঘরের জানালা দিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল সে। শার্সিগুলো হাঁ-হাঁ করছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রঙ জ্বলে-যাওয়া পুরোনো টালির ঘরগুলো। তাদের মাথার উপর দিয়ে আরো দূরে তাকালে চোখে পড়ে বহুদূর গিরিশ্রেণী। নির্বাত আগুনের হল্‌কায় বসে বসে ঝিমোচ্ছে। মস্‌লিনের জামাটা গা থেকে খুলে ফেললে মেরী। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, সব ফেলে দিয়ে অর্ধনগ্ন শরীরে এলিয়ে পড়ে বিছানায়। নিজের দুঃখ নিয়ে নিরিবিলি নিঃসঙ্গ দু'দণ্ড কাটায়। একটু পরেই বালিশে মুখ গুঁজে বিপর্যস্ত পাগলিনীর মত অঝোর

অশ্রুতে ভেঙে পড়ল মেরী। শার্সির কাচের ওপর একটা ভোমরা মাথা ঠুকে মরছে। যেন বাইরের নিস্তরঙ্গ নীলাভ সমুদ্রের একটি মাত্র চঞ্চল দ্যুতি। বিছানার উপর অর্ধনগ্ন ঐ যে কিশোরী বাঁধভাঙা কান্নায় ভাঙছে তার শরীরে রমণীয় বরণীয় পূর্ণতা এসে পড়েছে তা দেখবার মানুষ কই সংসারে! তার বেদনায় একটু মমতা দেখায় এমন একটি মানুষ নেই কোথাও। ঘরের দেয়ালে কাগজের বেগুনী ফুলগুলো কত দিন ধরে যে এই ঘরের অলঙ্কার হয়ে আছে, তা বোধ হয় কারো মনে নেই। এই যে শহর—এখান থেকে যৌবন চির নির্বাসিত। কোন নিষ্ঠুর নিয়তি বুঝি এখানকার বসন্ত-রস নিঙড়ে নিয়ে চলে গেছে চিরদিনের মত। যৌবনের দেখা পাবে না তুমি পথে-প্রান্তরে-লোকালয়ে—কোথাও। এই ঘরের পালঙ্কটি যেন অনন্ত কালের স্রোতহীন বদ্ধ জলের উপর ভাসা রুদ্ধগতি তরণী। এ পরিবেশে প্রাণ নেই—যৌবন নেই—মাধুরী নেই। আছে শুধু হাঁফিয়ে-ওঠা মনের দীর্ঘশ্বাস।

ভেজা বালিশে ঠোঁট চেপে মেয়েটি অস্ফুট নাম ধরে ডাকে—গিল্‌স গিল্‌স, গিল্‌স। তিনটি বার তার দেখা পেয়েছে সে এত দিনে। বনভোজনে একবার। আর দু'বার লেরো নদীর ঘাটে। আহা, সেই দু'বারই দেখার মত দেখা হয়েছিল। নিকোলাসের সঙ্গে ঘাটে নাইতে এসেছিল সে। সোনালী চামড়ার উপর জলবিন্দুগুলি রোদ্দুর লেগে ঝক-ঝক করছিল। মানুষটি যেন গায়ে সোনার ছিটে লাগা নেকড়ে বাঘ। তার পাশে নিকোলাস স্যাঁতস্যেঁতে নোঙরা। গিল্‌স তাকে চেঁচিয়ে সাড়া দিয়ে বলেছিল, পোশাক বদলে আসা অবধি অপেক্ষা করতে। একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস। গিল্‌স বলেছিল, ও ঘর জাগছে দাঁড়িয়ে। আগাথা এসে যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। যা ঘটছে আশে-পাশে সে যেন কিছু দেখেও দেখছে না। আবার

দেখা হবার কথা হয়েছিল দু'জনের। সেই দুটি ঘণ্টা সময়। মনের পেয়ালায় তার উপচে পড়েছিল অমৃত। আর একবার সেই মাধুরী সে যৌবনপাত্রে ভরে নিয়ে আকণ্ঠ পান করবে। যত মূল্যই লাগুক, তা দিতে কৃপণতা করবে না মেরী।

কিন্তু সে? সে কি এমন করে নিঃসঙ্গতার বেদনা ভোগ করছে? ভাবলে মেরী। তিন বছর গীর্জায় যেত না। এই ক' দিন ধরে যেতে শুরু করেছে আবার! সে শুধু তাকে দেখবার লোভে। শেষ বার যখন দেখা হয় সে ত বলেছিল যে মাদাম আগাথা তাদের দু'জনের সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। বলেছিল যে, নিকোলাসকে মনে মনে ভালবাসে আগাথা। কথা শুনলে মনে হয় যেন মাদামের মত মেয়ে মানুষ কোন পুরুষকে কখনো ভালো বাসতে পারে না। যতই নরম নরম চাউনি দিক, ওরকম মেয়ের মনের ভিতর কি হচ্ছে তা কেউ বলতে পারে না। তা যদি না হবে তবে এখন এক রকম আর পরমুহূর্তে আর এক রকম—এ সব ওলট-পালট কথাবার্তা কেন বলে মাদাম? ইচ্ছে হল ত এমন ভাব দেখালে যেন তার সবটুকু মধু—সবটুকু প্রীতি। তা নয়ত আসলে ও বুড়ী হল বিষাক্ত মাকড়সা। ঘাসের আড়ালে হিলহিলে সাপ। দেখলে মনে হয় যেন ওর বুকের ভেতর কুরে কুরে খাচ্ছে কি। হয়ত বা ক্যানসার পোষা আছে শরীরে। অমন মেয়েমানুষ যদি পৃথিবী থেকে সরে পড়ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচত মেরী। না, না। তখুনি শিউরে উঠল মেরীর কিশোরী মন। ভারী খারাপ চিন্তা করছে ত সে। আগাথা মরে যাক—তা সে চায় না। কিছুতেই চায় না। এমনি, রহস্য করে ওকথা ভাবছিল। ভগবান, তুমি কৃপা করে ওকে বাঁচিয়ে রাখ। আগাথাকে মরতে দিও না তুমি।

তাহলে সংসার-সমুদ্রে তাকে একা ভাসতে হবে। কর্ণধার থাকবে না যে তাকে নিরাপদে তীরে তুলে দিতে।

॥ ৩ ॥

যার কথা ভেবে একটি অর্ধনগ্ন মেয়ে পরনের সাজ ফেলে একলা বিছানায় শুয়ে অঝোর কান্নায় ঝরিয়ে দিচ্ছিল নিজেকে, সে ছেলেটি তখন বন্ধু নিকোলাসের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলের ধারে আরাম করে বসে। বছর তেইশ বয়স ছেলেটির। সাজে-শরীরে কোথাও তেমন কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। তেইশ বছরের অন্য সব ছেলেদের মত নিতান্তই আটপৌরে। তার যা কিছু রূপ গুণ জৌলুষ, সব একটি বয়ঃসন্ধিকালের মেয়ের চোখে। আর বন্ধু নিকোলাসের কাছে। বন্ধুর মা-ও ছেলেটিকে ভালবাসেন—তবে তাঁর মতামতের কে-ই বা দাম দিচ্ছে! তিনি জানেন এখানকার সমাজের একটি মূল্যবান ভালো ছেলে হল গিল্‌স। জেনারেল কাউন্সিলের মেম্বার, নামকরা ডাক্তার যার বাপ। তেমন ছেলে যে তাঁর নিকোলাসের বন্ধু—এ বড় কম তৃপ্তি নয় মায়ের। সেই গিল্‌স তাঁর বাড়িতে তাঁর হাতের রান্না খেতে রাজী হয় এ কি কম গৌরবের! আর শুধু তাই? সব রান্নার কত তারিফ করে সে। মাংসের গ্রীল দু'বার করে চেয়ে নিয়ে বলে যে, এমন সুস্বাদু উপাদেয় রান্না সে জীবনে খায়নি।

—'না বাবা গিল্‌স, এ তোমার মন রাখা কথার কথা। বাড়িতে মা'র কাছে এর চেয়ে কত ভালো জিনিস তুমি রোজ খাও। ভালো না হোক, অন্তত এর চেয়ে নীরেস যে নয় তা আমি জোর করে বলতে পারি। আমাদের উনি অবশ্য বেঁচে থাকতে বলতেন যে, বড় লোকেরা যে সবাই আমাদের চেয়ে ভালো রান্না করে, ভালো জিনিস খায় তা নয়।'

মায়ের এই ধরনের কথায় নিকোলাস নিশ্চয়ই লজ্জিত বিরক্ত

বোধ করে, প্রথম প্রথম ভাবত গিল্‌স। কিন্তু সে ভুল তার অনেক দিন ভেঙেছে। বন্ধু তার মা-গত প্রাণ। মায়ের কোন দোষ দুর্বলতা তার চোখেই পড়ে না। এই ঘরে তাদের খাওয়া শোওয়া দুই হয়। অন্ধকার স্যাঁতস্তেঁতে ঘর। জীবনে কখনো রোদ ঢোকে না। কাচের জারের নীচে একটা ঘড়ি আর দেয়ালে রঙীন লিথোছবি বহুকালের সাক্ষী এদের সংসারের। তবু এই শ্রীহীন সামান্য ঘরটি নিকোলাসের লেখা কবিতায় কেমন অসামান্য পবিত্র হয়ে ওঠে। প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস বাক্যহীন প্রাণময়তায় যেমন সজীব মুখর হয়ে ওঠে, তেমনি তার বৃদ্ধা জননীও তরুণ কবির চোখে সামান্য নারী হতে অনন্যা হয়ে ওঠেন। স্নিগ্ধ কারুণ্যের আভায় তাঁকে মনে হয় যেন অমর্ত্য-বাসিনী দেবী।

আর বন্ধুর চোখে গিল্‌স হল এ পৃথিবীর সব তারুণ্যের, সব সুষমার, জীবনের সব ভঙ্গুরতার মূর্তিমান প্রতীক। পৃথিবীর এই অপস্রিয়মান আশ্চর্যময়তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে নিকোলাস। মনে তার কোন ক্ষোভ থাকে না। চেয়ে থাকে সব-কিছুর দিকে, যাদের উপর কালের ক্ষয়ক্ষতি-লাঞ্ছনার দাগ পড়েছে। বন্ধুকে সে ভালোবাসে। এই খাওয়ার টেবিলে বসে তার মন জানে না কি দিয়ে উদরপূর্তি করছে সে। মা কি বলছেন সে-কথার কি জবাব দিচ্ছে গিল্‌স। কিছুই তার কানে যায় না। শুধু এই পুলকিত আনন্দে তার মন নিরন্ধ্র হয়ে থাকে যে গিল্‌স আছে তার বাড়িতে। আছে তার অতি কাছাকাছি। এই কাছে থাকার একটি মুহূর্তের আনন্দও সে বৃথা যেতে দিতে চায় না। গিল্‌সের বন্ধুত্ব তার ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁর অপার করুণা যে গিল্‌সের সান্নিধ্য তার ঘরে, তার প্রাণে, তার জীবনে দূরপ্রসারী আয়ুর প্রতিটি পলাতকা মুহূর্তে। গিল্‌সের ভালোবাসা তার প্রাণকে, কালকে আচ্ছন্ন করে আছে—থাকবেও।

প্যারিসের সমাজে তাদের দেখা ঘটে কদাচিৎ। ক্বচিৎ যখন সাক্ষাৎ হয় তাতে মনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না।

প্যারিসে নিকোলাস থাকে লিসেতে। আর দিনভোর লেক্‌চার নিয়ে ব্যস্ত থাকে গিল্‌স। সেখানে সে অন্য লোকের। অনেক অনেক লোকের। সেখানে বেশি করে তাকে পায় না নিকোলাস। এতে কোন দুঃখ থাকে না তার। না পাওয়াই ভাল। সংসারে যাকে সে সর্বাধিক ভালোবাসে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই তার পক্ষে মঙ্গল। বিরহের নিঃসঙ্গ আসঙ্গে প্রিয়জনকে সব থেকে বেশি করে পায় মানুষ, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস।

ছুটির সময় দু'জনে আসে ডোর্থেতে। তখন বন্ধুকে বড়ো আপন করে পায় নিকোলাস। যদিও গিল্‌সের মুখে লেগে থাকে শুধু মেরীর কথা। গিল্‌স বলে মেরীকে সে কত ভালবাসে। তার তেইশ বছরের জীবনের সর্বোজ্জ্বল তারকা মেরী। নিকোলাস যে মন দিয়ে শুনছে তার কথা এই তার যথেষ্ট। সে ভিন্ন আর কারো কাছে মেরীর কথা এমন করে বলতে পারে না গিল্‌স। নিকোলাসের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ তাই তার কাছে অরুচিকর বোধ হয় না কোন মতেই।

এখন খাওয়ার টেবিলে বসেও গিল্‌সের মন মেরীর কথায় ফিরে ফিরে যেতে চায়। নিকোলাসের মা রান্নাঘরে খাবার ঘরে বারে বারে আনাগোনা করছেন—সেই ফাঁকে ফাঁকে কথাটা পাড়ছে গিল্‌স।

—'দু'বার আজ মাথা ফিরিয়ে দেখেছিল না?'

—'দু' বার কেন তিন বার ত!'

—'তুমি দেখেছিলে, তিন বার? কিন্তু ঐ মেয়েটাও সেই সঙ্গে দেখছিল আমাদের দিকে। আমি ত ভেবেছিলাম তোমার মুখ রাঙা হয়ে উঠবে।'

—'আঃ গিল্‌স ! দোহাই তোমার, মাদাম আগাথার কথা পেড়ো না তুমি এ সময়।'

—'বাঃ—সে যদি তোমায় ভালবেসে ঘুরে ঘুরে দেখে, সে বুঝি আমার দোষ হল ?'

—'তোরা ওকে 'গালিগাই' বলিস কেন রে ?'—মা ওদের মুখের কথা কেড়ে নেন।

ছুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে বসল নিকোলাস।

—'জানিস গিল্‌স, ছুটি ফুরোলে শুধু আমার একটি মাত্র সান্ত্বনা থাকে যে ঐ মেয়ের কাছ থেকে অন্তত কয়েক শ' মাইল দূরে পালিয়ে যেতে পারব আমি। অন্তত যখন তখন অনাহূতের মত বাধা হয়ে এসে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না। তুই জানিস, ঐ ও—রীতিমত আমার ঘরে হামলা করে।'

'—তা হোক। তুই না আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলি যে তার সঙ্গে কখনো মনোমালিন্য করবি না! ওই আমাদের একমাত্র ভরসা জানিস। মেরীর আর আমার বিনি সুতোর বাঁধন। ও যদি তোর নির্জন নিরিবিলির রস হানি করে আর তুই করিস আমাদের, তা'হলে আমরা ছুটি প্রাণী ত নিরুপায়।'

—'কি যা-তা বলিস তুই ?'

বন্ধুকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে তোলার আনন্দে গিল্‌সের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মা বললেন—'তোরা ছু'জনে কার কথা বলাবলি করছিস রে ?'

মস্ত ডিশে করে বিরাট পরিমাণ মিষ্টি নিয়ে এসেছেন মা। ডোর্থের লোকের নামে নিন্দে যে ভরপেট খাওয়ার পরেও মিষ্টি পেলে এরা ছাড়ে না। এখানকার মানুষ তারও রীতিমত সদগতি করে তবে টেবিল ছেড়ে ওঠে।

—'মাদাম আগাথার কথা হচ্ছিল।'

—'বুঝলাম'—গিলসের কথার এক কথায় জবাব দিলেন মা।

মুখে ভণ্ড ভালোমানুষী এনে গিল্‌স বললে—'আপনার কেমন লাগে তাকে? ভালো লাগে না?'

—'আসে এখানে। এসে পড়ে যখন তখন। এমন ভাব যেন এটা আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়। রাস্তার যে-সে লোকের জন্যে আমরা হোটেলের দরজা অবারিত খুলে রেখেছি। আমার সঙ্গে কথাবার্তা নেই, সোজা হুট হুট করে একেবারে নিকোলাসের ঘরে গিয়ে উঠল—কোন ভয়-ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়েটার। কিছুই আশ্চর্য নেই। হয়ত আমার ছেলের ওপর মেয়েটার কোন নজর আছে।'

এক মুখ আতঙ্ক নিয়ে নিকোলাস বলে—'তুমি চুপ কর মা—ওকথা বাদ দাও।'

—'গত বারই আমি ওকে একটু শিক্ষা মতন দিয়ে দিয়েছি মানে মেয়েটাকে এমন ভাবে আঁতে ঘা দিয়ে বলেছি যে প্রাণ থাকতে আর তাকে নিকোলাসের ঘরে যাবার সিঁড়ি ভাঙতে হবে না।'

গিল্‌স তবু গম্ভীর হয়ে বলে—'কিন্তু ও ত যে-সে মেয়ে নয়। কাঁব্লাঁদের ঘরের মেয়ে—রীতিমত কাউন্ট ছিলেন ওর বাবা।'

—'তা আবার নয়। নিজের মেয়েকে রোজগার করতে পাঠিয়ে যে বলে যে মেয়ের রোজগার জমিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেবে—সে যে কত দরের কাউন্ট তা আর আমার বুঝতে বাকি নেই। আর কাজের ঘটাই বা কত? ওদের ঘরে আগাথা কি ইজ্জতের কাজ করে, সেও আমরা সবাই জানি।'

'তুমি চুপ করো মা।' চোখ বন্ধ করে মাকে মিনতি করে নিকোলাস। মা যখন এই ধরনের কথা বলেন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে না সে।

মনে মনে খুব খুশী হয় গিল্‌স। তবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—"আহা, অভিমানিনী গালিগাই।'

মা মুখ ফিরিয়ে বলেন—'গালিগাই কে?'

—'আপনি ত জানেন আগাথার বিয়ে হয়েছিল একজন ব্যারনের সঙ্গে।'

—'বিয়ের রাত্তিরেই ত বর ওকে ফেলে পালিয়েছিল। হাঁ হাঁ—মনে পড়েছে। ব্যারনের ঠাকুমার অঙ্গীকার ছিল যে, নাতি বিয়ে করলে তবে কুড়ি লাখ টাকার সম্পত্তির অধিকারী হবে। বিয়ে ঠিক হল, সম্পত্তির কাগজ-পত্তর সেই দিনই নিজের নামে লিখিয়ে নিলে ঠাকুমার কাছে। সন্ধ্যাবেলা যখন কনেবৌ সাজ করতে আড়াল হল, সেই যে সরে পড়ল আর ও বৌয়ের মুখ দেখলে না—'

'যা বলছেন সত্যি?'—গিল্‌স অবাক চোখে চাইলে।

বন্ধুর দিকে চাইলে নিকোলাস। দৃষ্টিতে তার বিষণ্ণ বেদনা। ভৎর্সনার স্বর বাজল তার কথায়।

—'মা যা বলছেন, এ সব কথা তুমি ত নিজেও জান। এ সব ত নতুন কিছু নয়।'

মিষ্টির ডিশ থেকে চোখ তুললেন মা। তাঁর দিকে তাকালে প্রথম নজরে পড়ে তাঁর তীক্ষ্ণ নাসা। চশমার পিছনে চোখের মণি দুটি চকচক করে উঠল তাঁর। বললেন—'আর তোমার সে লোক একাও সরে পড়েনি।'

—'তবে?'—শুচিবায়ুগ্রস্ত পণ্ডিতের মত আশঙ্কিত কণ্ঠে বললে গিল্‌স—'সঙ্গে ছিল কে?'

আগের মতই প্রতিবাদের কণ্ঠে বললে নিকোলাস—'কেন মিথ্যে মায়ের মুখ থেকে তুমি ঐ সব নোংরা কথা বলিয়ে নিচ্ছ ভাই? এ তোমার মোটেই শোভন হচ্ছে না।'

—'অল্পবয়সী কোন মেয়েমানুষ নিয়ে নয় অবশ্য।'

গিল্‌স সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বন্ধুর প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে সে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বললে—'তবে কা'কে নিয়ে গিয়েছিল?'

—'সে কথা যদি না জান ত আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলে তুমি।' বৃদ্ধার গলার স্বরে এতক্ষণে চেতনা হল গিল্‌সের যে শালীনতার সীমা অতিক্রম করে সে অনেক দূর অনধিকার অগ্রসর হয়ে এসেছে।

জানালার শার্সি তুলে দেখলেন মা। সূর্য অন্তরাল হয়েছে। ঝড় আসন্ন আকাশে। গীর্জার ঘণ্টাধ্বনিতে সান্ধ্য ভজনের আহ্বান রণিত হচ্ছে আকাশ-মৃত্তিকায়। বাইরে ছোটদের পদধ্বনির ঐকতান উঠেছে। লঘু কণ্ঠের কোলাহল শোনা যাচ্ছে ঘরের ভিতর থেকে। আর পনেরো মিনিট পরে ঐ সব ছোট ছোট হাতে ধর্মপুস্তকের পৃষ্ঠা অবারিত হবে। ভগবানের মহিমা কীর্তনে লাতিন গান উঠবে কচি কচি কণ্ঠে অর্গানের স্বর সমন্বয়ে। কিন্তু সে পবিত্র লাতিন গানের একটি বর্ণও মর্মবোধ্য হবে না তাদের।

তা না হোক। মন্ত্র ত আর মুখের কথা নয়। মন্ত্র হল হৃদয়ের মুখর স্তব। তাই সে প্রশ্ন তখন অনাবশ্যক মনে হবে।

॥ ৪ ॥

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেরী। সান্ধ্য-ভজনের মন্দ্রিত ঘণ্টাধ্বনিতেও ঘুম ভাঙল না নিদ্রাময়ীর। মাদাম আগাথা যখন নিঃসাড়ে ঘরে এল তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে মেরী। মাদামের হাতের ট্রেতে দু'টি ভাজা চিংড়ি মাছ পরিপাটি করে সাজানো। তার সঙ্গে

ক'খানি বিস্কুট, এক মুঠো শুকনো পীচ ফল আর একখানা কেক, তাও এমন ফোঁপরা যেন ইঁদুরে কুরে কুরে খেয়েছে।

বিছানার উপর এলায়িত ঐ নবীন নগ্ন তনুর ভঙ্গীটি কি বিষণ্ণ করুণ দেখাচ্ছে, ভাবলে আগাথা। কান্নার সঙ্গে লড়াই করে শেষে ঘুম জিতে নিয়েছে নব-কিশোরীকে। তার কোলেই শান্তিতে ঘুমুচ্ছে মেয়ে। সন্নদ্ধ সুডৌল বাহুতে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে মেরী। একটি নিরাবরণ পা ঈষৎ বঙ্কিম হয়ে এলিয়ে আছে বিছানায়। নগ্ন জানুটি দেখা যাচ্ছে মসৃণ উজ্জ্বল। যেন কল কল কাকি-চক্ষু জলের নীচে একটি নিটোল উপল। পৃথিবীর কোন মানুষ যাকে স্পর্শ করেনি আজো। ঘুমন্ত মেয়ের আর একটি পা শয্যাপ্রান্ত থেকে ঝুলে আছে নিরালম্ব হয়ে। সেই নগ্নতায় বিকেলের পড়ন্ত আলোর সোনা লেগেছে। সুডৌল সেই পা দেখে মনে পড়ে, অরণ্যচারী কোন নবীন প্রাণীর নিটোল সুন্দর লজ্জাহীন শরীর।

লীলায়িত মৃণাল বাহু দুটি অর্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে আছে মুখখানি। এক ঝলকে মনে হয় যেন ফুলের সাজির সোনার হাতল। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বলে নরম বুক ঈষৎ উন্নত হয়ে আছে দু'টি মধু-ভাণ্ডের আশ্রয়ে। তার তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কাঁধ ও বাহুর সঙ্গম ভূমিতে কৃষ্ণাভ সোনার উদ্গম। ঘামে ভিজে গেছে সারা মুখ বুক বাহুমূল। একটা স্বেদসিক্ত গন্ধ পেল আগাথা। প্রাণিদেহের গন্ধের চেয়ে অস্ফুট সে গন্ধের আভাসে সোঁদা মাটি আর জল, সমুদ্র জোয়ার আর কাননভূমির সুরভির রেশ যেন বেশি। জানালার কাচে নিজের শরীরের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ তুলে তাকাল আগাথা। হাড় বের-করা মেচেতা-ধরা মুখখানা চোখে পড়ল। গায়ের ব্লাউজটা ভাঁজ-ভাঙা। তারও বাহুমূলের নীচে অমনি অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্বেদকণা জমেছে নিশ্চয়ই, না দেখেও তা অনুভব করলে আগাথা। বুকের জামাটা তার সামনের

দিকে ঢিলে হয়ে থাকে। 'এত বয়সেও ভাল করে ডাগর হল না আমার বুক' মনে মনে ভাবলে আগাথা। যা হয়েছে তার চেয়ে মোটে না হলেই বোধ হয় ছিল ভাল। সেইখানে দাঁড়িয়ে মেরীর নবীন যৌবনের দু'টি পূর্ণকুম্ভ চোখে পড়ল না বটে, কিন্তু আগাথা জানে সে দু'টি দেখতে কেমন। যে সোনার-আলো পড়েছে মেরীর নিটোল গড়ন পায়ের উপর, সেই আলো তারও ছিনে বার-করা হাতের উপর পড়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আগাথা।

রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে ছিল আগাথা। দাঁড়িয়ে ছিল অন্য মনে। এমন সময় ঘুমন্ত মেয়ে নড়ে-চড়ে সাড়া দিল—'কে?'

ট্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে আগাথা বললে—'তোমার খাবার এনেছি। তার আগে গা-বুক ঢেকে নাও ভাল করে।'

—'সাড়া দিয়ে আসবে ত?'—বললে মেরী—'তোমায় আসতে দেবার আগে অন্তত ফ্রকটাও ত পরে নিতে পারতাম।'

—'তুমি আবার আমায় আসতে দেবে কি? তুমি কি আমায় কিছু বারণ করতে পার?'

হায়, হায়! এই সন্ধ্যাবেলাতেই সে কি না মাদামের মনকে বিমুখ করে ফেললে! মাদামই ত তার একমাত্র আছে। সেই তার আশা, তার শেষ ভরসা। মাদামের গলায় দু'টি হাত জড়িয়ে দিলে মেরী।

—'কি করেছি গো আমি? কেন আমায় আগের মত ভালবাসো না মাদাম?'

তন্বী মেয়েটির বুকের তাপ লাগল আগাথার শরীরে।

—'হয়েছে, হয়েছে। উঠে পড়।'

আলগা হাতে মেরীকে সরিয়ে দিলে আগাথা।

—'নাও উঠে পড়। পরার যা পরে নাও—তার পর চল খেয়ে নেবে।'

—'আমার খিদে নেই।'

—'তোমার বয়সে ত সর্বদাই খাই-খাই হবে। ক্ষিদে নেই কেন?'

মাদাম তাকে মসলিনের একটা ফ্রক পরিয়ে দিলে। তার পর গুছিয়ে নিয়ে বসালে টেবিলে। যত্ন করে খাওয়াতে লাগল।

'চিংড়ি মাছ খেতে কত ভালবাস তুমি। শুধু এই কটি তোমার বাবা রেখে গেছেন। তিনি খেতে আরম্ভ করলে শেষ না করে থামেন না ত।'

মেরী তেমনি করে একটা কাঁধ তুলে নাড়া দিলে। খেয়ে খেয়ে বাবা যদি পেট ফাটিয়ে ফেলেন, তাতে তার কি—তার গিল্‌সের কি? যদি মা বাবা হঠাৎ উধাও হয়ে যান, যদি তাঁরা কোথাও না থাকেন, তাতেই বা কি আসে-যায়?

হাতের আঙুল মুছতে মুছতে বললে মেরী—'আচ্ছা, সালোঁদের সঙ্গে আমাদের কিসের তফাৎ? কিসে আমরা উঁচু তাদের চেয়ে?'

আগাথার ঠোঁট দু'টি কুঁকড়ে যেতেই, তার দাঁতের ঈষৎ লক্ষণ দেখা গেল। শক্ত শক্ত ভারী দাঁত। কোন শ্রী নেই, ছন্দ নেই। কষের দাঁতগুলো আবার বড়ো বড়ো।

স্মিত হেসে বললে আগাথা—'সে কথা জিজ্ঞেস কোরো মাকে। ওসব জাত-বেজাতের উঁচু-নীচুর ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না।'

'বলো না তুমি—কিসের তফাৎটা?'

গলায় মধুর চেয়ে মাধুরী ঢেলে কোমল করে বললে আগাথা—'তফাৎ? তফাৎ হল কাল পিঁপড়ে আর লাল পিঁপড়ের তফাৎ।'

'ও আমি বুঝতে পারলাম না।'

'বোঝবার কিছু নেই বাছা।'

সে-ও ত কাঁর্ন্নাঁদের ঘরে জন্মেছিল। তার বাবা ছিলেন কাউন্ট। ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের চেয়ে স্বনামখ্যাত মহিম্ন পরিবার একটিও

ছিল না গ্যাসকনিতে। পুরো চুয়াল্লিশ ঘণ্টার জন্যে সে-ও তো ব্যারণের বৌ হয়েছিল। তাদের বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলা বিয়ের জুতো পায়ে দিয়েই তার ব্যারণ স্বামী বাবার বাগানের মালিনীকে নিয়ে উধাও হয়েছিলেন। রোম-কোর্টের মহামহিম বিচারপতি তাকে স্বামীর উপাধির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিলেও, ভুলতে পারে না তো আগাথা যে, সে ব্যারণের স্ত্রী, কাউণ্টের মেয়ে। সালোঁ বলো আর দুবের্নে বলো, ওরা সবাই সমাজের নীচ তলার নোংরা-লাগা পরিবার। তাদের চেয়ে বরং সমাজের সাধারণ লোক—যেমন নিকোলাসরা—ঢের ভাল—ঢের উঁচু। উঁচু-ঘরের মেয়ে বলে কোন মিথ্যে ভণ্ডামি কি আত্মপ্রবঞ্চনা অন্তত তার মনে নেই। তার এক দিনের স্বামী যেদিন থেকে তাকে পরিত্যাগ করে গেছেন, সেদিন থেকে জাতের উপর আগাথার মনে ঘৃণা ভিন্ন আর অন্য কোন অনুভূতি অবশেষ নেই। যেদিন দুবের্নেদের ঘরে সে গভর্নেসের কাজ নেওয়ার সঙ্কল্প জানায়, সেদিন বাবার প্রতিকূল মতকে সে এই যুক্তিতে খণ্ডন করতে পেরেছিল। বাবা মানুষের সামাজিক দর নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তার গর্ব ছিল তার জমিদারীর মাটি। সেই মাটির বেদীতে তিনি জীবনের সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন। ভুল করেছিলেন বার বার। বেলমতের আঙ্গুর-বাগানে রাশি রাশি টাকা ফেলেছেন। কিন্তু কিসের কী? সেই আঙ্গুর-বাগান তার সম্পত্তি গ্রাস করেছে বছরে বছরে। পুরোনো জিনিস বদলে নতুন কল বসাননি—ভুল সময়ে আঙ্গুর বেচতে গিয়ে ভারী ভারী লোকসান খেয়েছেন কত বার। এখন জমি বাগান-বাড়ি সব বন্ধক দিয়ে কে.ন ক্রমে টিঁকে থাকা। মেয়ের মাইনের অর্ধেক উড়িয়ে দেন জুয়ায়। লোকে বলাবলি করে—'বাপের খরচ চালাতে মেয়েটাকে শেষ অবধি জাত খোয়াতে হল।'

কিন্তু তাই কি সত্যি ? জীবিকার জন্যে লোকে যা করে তাতে সামাজিক গৌরব ভ্রষ্ট হয় না কি মানুষের ? এ কথা কি কেউ কখনো ভাবে যে আগাথা স্বেচ্ছায় নেমে এসেছে নীচে ? নষ্ট করেছে সে নিজেকে ? তার মনের হদিস অন্য লোকে পাবে কি করে ? নিজের ভবিতব্যকে নিজের হাতে রচনা করে রেখেছে সে। সেই বাসনামুখী রাজপথ ধরে উৎরাই পেরিয়ে নীচু তলার দিকে ছুটে যাচ্ছে সে। যাচ্ছে বিশেষ একটি মানুষকে লক্ষ্য করে। স্বেচ্ছায় সে নেমে এসেছে—আরো নীচে নামবে। যত দিন না সেই সমাজ-স্তরে পৌছায়, যেখানে তার মনের মানুষটি নিত্য আহার-বিহার করে। তাকে সঙ্গিনী নিয়ে তার নিকোলাস অগ্রগামী হবে। সমাজ-সংসারের এই সব ছোট-বড়র সামান্যতা অবহেলা করে একদিন তারা দুই মানুষে মহত্ত্বের সত্যিকার স্বর্ণশীর্ষে উঠবে।

সেই কথাই অহোরাত্র ভাবে আগাথা। নিকোলাসের অগোচরেই আগাথা নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ করবে তার জীবনে—তার পর ধীরে ধীরে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে তার প্রাণের ভূমিতে। এখন নিকোলাস তাকে ফেলে দূরে চলে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু তীব্র মনঃশক্তিতে সে তার নাগাল ধরবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো প্রেমেও সে ইচ্ছাশক্তির সাফল্যে বিশ্বাস করে।

অপদার্থ মেয়েলী ব্যারণের প্রতি সত্যিকার অনুরক্তি কোন দিনই সঞ্জাত হয়নি তার মনে। ইচ্ছা করলে তাকে বেঁধে রাখতে পারত আগাথা তার গায়ে। সেটুকু ক্ষমতা প্রকৃতি তাকে না চাইতেই দিয়েছেন। সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই তার মনে। আর এ সংসারে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মে পুরুষকে আপন রসে আসক্ত করতে পারবে না, এমন কি হয় ? তার মেয়েলী শরীর-মনে এমন কিছু লোভনীয় যদি না থাকত তবে মেরীর বাবা—অমন যে প্রবীণ মানুষ

তিনি তার দিকে অমন লোভীর মতো তাকিয়ে কি দেখেন ? কি ভয়ে নিজের শোবার ঘরে খিল লাগিয়েছে আগাথা ? ঐ প্রাসাদের ঘরের ছেলে নিকোলাস—দিন-রাত যার মন পড়ে আছে গীর্জায়—তার কাছেও যদি কোন দিন আগাথা নিজের মনকে অবারিত করে দেয়, বিকশিত ফুলের মতো রস মধুরতায় খুলে ধরে নিজেকে, সে-ও কি তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে ? পারবে না যে তা জানে আগাথা। নইলে আগাথার মতো কুরূপা মেয়ের সঙ্গে নির্জন হতে অত ভয় কিসের নিকোলাসের ? সে কি তাঁর চিত্তের ভীরুতা নয় ? নয় যদি, তো অমন পিপাসিত দৃষ্টিতে কি দেখে সে আগাথার দিকে ? আগাথা জানে, নিকোলাস মনে মনে তাকে কামনা করে। আসঙ্গ তৃষ্ণা নিয়ে একটি রমণীর রমণীয়তাকে সে মনে মনে ধ্যান করে।

—'তুমি আমার একটা কথাতেও কান দিচ্ছ না'—মেরীর কথায় চমক ভাঙ্গল আগাথার। কে জানে কতক্ষণ ধরে মেয়েটা আপন মনের আনন্দে কথা কয়েছে !

—'আমাদের দু'জনের ওপর তোমার এত বীতরাগ কেন বলতে পারো ? তোমার জন্যেই তো সেই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।'

—'বুদ্ধি-শুদ্ধি তোমার লোপ পেয়ে গেছে মেরী ! নিকোলাস আমার পরিচিত বন্ধু। গিল্‌স তার সঙ্গে ছিল সেদিন—তাই তার সঙ্গেও তোমার পরিচয় হয়েছিল। তোমাদের চেনা-শুনায় আমার কিছুমাত্র হাত ছিল না।'

—'আমার মাদাম আগাথার মত এমন দরদী মেয়েমানুষ কি চোখ চেয়ে না দেখে থাকতে পারে যে, গিল্‌সের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা থেকে কি ভাব হয়েছে মনে মনে। তুমি সব দেখেছিলে।

তাই না বার বার আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছ তুমি? তোমার কাছে আমার কত যে কৃতজ্ঞতা মাদাম—'

কী উৎসুক দৃষ্টিতেই না আগাথার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মেরী। সে মুখে কোন ছল-ছলনার ছায়া নেই। মেরী নিশ্চিত জানে, গিল্‌সের সঙ্গে তার ভালবাসার আবেগ আগাথার মনের তন্ত্রীতেও ঝঙ্কার তোলে। সে কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে যে, মেরীর সঙ্গে গিল্‌সের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয় আগাথা তাদের দুটি প্রাণের প্রেমকে রসসিক্ত করতে। নিকোলাসকে একলা অধিকার করবার এ সব চাতুরী বোঝবার ক্ষমতা নেই অত অল্পবয়সী মেয়ের।

আজ-কাল নিকোলাস আর তাকে এড়িয়ে যায় না। তার প্রতি প্রেমমুগ্ধ বলেই যে তার সঙ্গে নির্জন সময় কাটায় নিকোলাস, এ বিষয়ে আগাথার মনে কোন বিভ্রান্ত মুগ্ধতা নেই। তবু এ কথা তো আর মিথ্যে নয় যে, বন্ধু গিল্‌সের প্রেমাভিসারে সুযোগ করে দেবার জন্যেই সে মেরীর গভর্নেসকে ব্যস্ত রাখে নিজের সঙ্গে। আগাথাকে নিয়ে যখন বনের আড়ালে অন্তর্হিত হয় নিকোলাস, তখন গিল্‌স মেরীকে নির্জনে একান্ত করে পায়। এ-সব সত্যি। এ-সবই বোঝে আগাথা। তবু তার ভাল লাগে। ছলে ছলনায় যা মেলে তাই দু' হাতের অঞ্জলিতে গ্রহণ করে আগাথা।

উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল আগাথা। দুই হাতে শার্সিগুলো উজাড় করে খুলে দিলে। চেয়ে দেখলে, আকাশের উজ্জ্বল নীল কখন তামায় বদলে গেছে। বাড়ির মাথায় কৃষ্ণ মেঘে সংবৃত আকাশ। সোয়ালো পাখিরা নেমে এসেছে, উড়ছে নীচু দিয়ে। গানের ধূয়োর মতো ধুলোর ঘূর্ণি ভূমি ছেড়ে এক একবার উঠছে আকাশমুখী হয়ে আবার তখুনি ভূমিলীন হচ্ছে। আর ক্লান্ত মৌমাছিদের ডানার গুঞ্জন শুনছে নিঃশব্দ আকাশ।

মুখ ফিরিয়ে মেরীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আগাথা। শান্ত নিস্তরঙ্গ মুখে বসে আছে মেয়েটি। সে মুখে কোন ভাবের লেশ নেই।

কঠিন কণ্ঠে বললে আগাথা—'আমি তো বিশ্বাস করতে পারি না যে, এই রকম ঘরে মানুষ হয়ে তোমার মত সতেরো বছরের একটা এক ফোঁটা মেয়ে ঐ রকম এক ছোকরার সঙ্গে এমন করে ভালবাসায় মেতে উঠতে পারো। আর শুধু তাই? তার সঙ্গে বিয়ের কথাও তোমার মাথায় এসে ঢুকেছে···তোমার মা-ও সব জিনিসটা জেনেছেন, বুঝেছেন। তিনি আমার কথাতেই সায় দিলেন যে ড়ুবের্নেদের সঙ্গে সালোঁদের ঘরের বিয়ের কথা—কল্পনাতেও আনা যায় না—'

—'হোক না তাই। তুমিই তো এখুনি বললে যে, ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ লাল কালো পিঁপড়েদের মতো—তার বেশী নয়।'

—'সে তোমায় আমি হাসাবার জন্যে রহস্য করে বলেছিলাম। তোমার ও পিনপিনে কান্না আমার ভাল লাগে না বাপু।'

আগাথার কোলে উঠে তার ব্লাউজের মধ্যে মুখ গুঁজে বসল মেরী।

—'আমায় একটুও ভালবাস না তুমি মাদাম! কেন বাসো না, বল না? বলো ভালবাসো। বলো একটু একটু ভালবাসো।'

আর মেরী ভাবলে সেও বুঝি আগথাকে একটু একটু ভালবাসে।

—'আমায় একটু আদর করো না'—আবদার করলে মেরী।

আগাথা কোলের শিশুর মতো তাকে বুকে চেপে সোহাগ করতে লাগল। অস্ফুটে একটা ঘুমপাড়ানী গানের দু'কলি গেয়েও ফেললে অকারণে।

—'তুমি এমন করে আমায় বুকের ভেতর চেপে ধরেছ যে নিঃশ্বাস

নিতে পারছি না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও'—আলগা হাতে ফ্রকটা নামিয়ে দিলে মেরী। তার পর চতুর চোখে আগাথার দিকে তাকালে রহস্যময়ী। বললে,—'কেন ভালবাসো না গো—বলো না কেন?'

—'তোমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না।'

মাদাম আগাথার মন হলে মেরীর মায়ের মনের বদল হতে পারে। তার ইচ্ছে হলেই হয়। আগাথা অবশ্য কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, মেরীর মায়ের উপর তেমন কোন প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তার। আর থাকেও যদি বা, যাতে মেরীর ভবিষ্যতে মন্দ হবে তেমন কাজ করবেই বা কেন তার গভর্নেস? সালেঁাদের বাড়ির ছেলেটা রূপে-গুণে কি-ই এমন সুপাত্র?

—'তুমি তাকে জানো না, তাই এমন কথা বলতে পারছ'—ধরা গলায় আগাথা জবাব দিলে—'আমি যা জানি তার বেশী তুমি নিজেও জানো না মেরী। সে যে কেমনধারা পুরুষ তার কোন ধারণাই নেই তোমার—অল্পবয়সী মন নিয়ে নিশিদিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ, কবে এসে সে তোমায় বুকে জড়িয়ে নেবে। কি জানে ও? নিজের রূপের যত্ন নিতে জানে না যে পুরুষ'—একটু থেমে, ধমকের সুরেই শেষ করলে আগাথা—'ওকে তো আমার নিজের খুবই বিরক্তিকর ঠেকে।'

আগাথা নিশ্চয়ই তামাসা করছে, ভাবলে মেরী। তাই হাসি মুখে জবাব দিলে—'সে সব আমি ভাবি না মোটেই। তবে—' চোখে-মুখে একটা বিকশিত উল্লাসে ফেটে পড়ল মেরী—'তবে ও শরীরের যত্ন নেয় না সে কথা তুমি ঠিকই বলেছ। অমন যে রূপ—'

গিল্‌সের সব ভাল লাগে তার। ওর অবিন্যস্ত, এলোমেলো চুলের রাশ, ওর অপরিচ্ছন্ন হাত—মাপের চেয়ে বড়ো বড়ো যে সব সার্ট গায়ে দেয় সে—সব মিলিয়েই তো গিল্‌সের রূপ। ওডিকোলনের

সুরভির সঙ্গে তামাক-পাতার গন্ধ মিশে পুরুষের গায়ের যে সুবাস—তা-ও সে ভালবাসে। তার গিল্‌স যেমনই হোক, সেই তার মনের মানুষ—তাকেই সে ভালবাসে।

গুরুভার মেয়ের চাপা গুরু-গুরু উঠল আকাশে।

—'বৃষ্টি এলে ভারি মজা হয়'—বললে মেরী—'তাই বলে শিলা বৃষ্টি নয়—।'

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখলে আগাথা, বৃষ্টি এল কি না।

—'এখনো এক ফোঁটা পড়েনি।' কিন্তু সে কথা যাক্। আজ বিকেলে গিল্‌সের সঙ্গে দেখা হতে পারে আমার।'

কৌতূহলে চকচক করে উঠল মেরীর চোখ—'নিকোলাসদের ওখানে নিশ্চয়ই।'

—'তা-ও হতে পারে। ঠিক বলতে পারছি না এখন। তা বলে ভেবো না—। তবে সে যদি কিছু বলে তো তোমায় আজই জানিয়ে দেবো। চিঠি-পত্র কিছু নয় বলে দিচ্ছি—সে ভরসায় বসে থেকো না যেন। আর কোন ভরসাতেই বসে থাকার দরকার নেই তোমার, সে বিষয়ে এখন থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

আগাথার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে সোহাগী কণ্ঠে বললে মেরী——'মন থেকে তুমি আমার পাথর সরিয়ে দিলে মাদাম। কি ভালো মেয়ে তুমি গো?'

—'আমি আবার কী করলাম। তার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। তা বলে তার পাত্তা খুঁজে বেড়াব না আমি। অত উৎসাহ আমার নেই।'

শুনে মেরীর মুখের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। নিরাশ কণ্ঠে বললে—'কি যে তুমি বলো মাদাম! এই আনন্দের স্বর্গে পৌঁছে দিলে

আবার নিরাশার নরকে নামিয়ে দিলে এখুনি। কেন তুমি বুঝতে চাও না যে আমার স্থখ স্বর্গ সব সে—'

এই উদ্ভিন্ন-যৌবনা বালিকার মুগ্ধমতি মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল আগাথা। তারপর গম্ভীর গলায় বললে—'আর পরিহাস নয় মেরী। আমি তোমায় সত্যি কথাই বলছি, জিনিসটার গুরুত্ব বোঝা উচিত তোমার।'

—'কি আবার বুঝব ? কি বোঝবার আছে শুনি ?'

মেরীর মুখ থেকে চোখ সরালে না আগাথা। নিষ্পলক দৃষ্টির ব্যঞ্জনায় যেন মেরীর মনের বীণাকে রণিত করতে চাইলে। মন দিয়ে ছুঁতে চাইলে তারই মনকে। নিজের মনের নিভৃত বার্তা নির্বাণী শুনিয়ে দিতে লাগল নিমেষহীন দৃষ্টিপাতে।

লঘু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মেরী।

—'আমি বড়ো বোকা মেয়ে, না মাদাম ?'

বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে মেরীর কপালে চুমু খেলে আগাথা।

—'তা আবার নয়—খুব বোকা মেয়ে।'

তারপর আদর করে বললে—'আমি চলে গেলে কি করবে গো বিরহিণী ?'

মা যতক্ষণ না যাচ্ছেন ততক্ষণ অপেক্ষা করবে মেরী। তারপর মা বেরোলে সেও গীর্জায় যাবে।

—'প্রার্থনা হবার আগেই পৌঁছে যাব আমি।'

—'খুব ভাল হবে। ভালো ভালো কথা শুনে মন অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।'

—'মন হাল্কা করতে চাইনে আমি। ভগবানের কাছে আমার কত প্রার্থনা আছে। আমি সব বর চেয়ে নেব।'

হাসতে গিয়ে আগাথার গজ-দন্ত দুটি বেরিয়ে পড়ল।

—'সালোঁদের ছেলেটার কথা তুমি ভগবানকে বল নাকি?'

—'বলি না আবার? বলা অন্যায় নাকি মাদাম?'

—'দুষ্টু মেয়ে। অন্যায় বলতে পারি কি? আমি ফিরে এলে আমার ঘরে এসে দেখা করবে। হয়ত রাত হবে আমার ফিরতে।'

—'গীর্জায় গেলে আমারও ফিরতে দেরী হয়ে যাবে হয়ত। সারা দিন বলতে গেলে কিছু খাওয়াই হয়নি। ততক্ষণে যা ক্ষিদে পেয়ে যাবে।'

দুবের্নেদের ছেলে-বুড়ো সব অবিরত কেবল খাই-খাই করছে। ভাবলে আগাথা। ভালবাসার হাওয়া-লাগা এই মেয়েটা অবধি একটি বারও সে কথা ভুলতে পারে না। আহার্য শেষে ট্রে হাতে নিয়ে আগাথা উঠে দাঁড়াতেই গভর্নেসের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে গেল মেরী। বলল—'আমায় নিয়ে যেতে দাও মাদাম।'

—'তুমি কেন নিয়ে যাবে মেরী? এই সব কাজ করার জন্যেই তোমার মা আমায় মাইনে দিয়ে রেখেছেন।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার আগে আর একবার মুখ ফেরালে আগাথা। বললে—'যাই করো বুদ্ধি বিবেচনা বর্জন করে বসে থেকো না মেরী। জীবনের অন্য সব খেলার মতোই হৃদয়ের খেলাতেও মাথার দরকার সব থেকে বেশী—একথা কখনো ভুলো না।'

॥ ৫ ॥

আবৃষ্টি-সংরম্ভ সমারোহ। ধারা পতন এখনও স্থরু হয়নি। চৌমাথা পেরিয়ে গীর্জার বিপরীত দিকের রাস্তায় এসে পড়ল আগাথা। এই পথের বাঁ দিকের সেই শেষ প্রান্তসীমায় নিকোলাসদের একতলা বাড়ি। বাড়ির কোল থেকেই মাঠের স্থরু। নিকোলাসদের বাড়ির বাগানের কোণটাকেই বলে বুলেঁভার্দ। যদিও ভুলেও কেউ এ চলন-বীথিতে কখনো পা মাড়াতে আসে না কোন দিন। বসার জন্যে যে পাথরের বেঞ্চি আছে তার উপর এ অবধি কেউ কখনো বসেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু লোকের কাছে যাই হোক, ঐ এক-ফালি জায়গা আগাথার প্রাণের প্রাণ। ঐখানেই তার সারা মন পড়ে থাকে, বিশেষ করে ছুটির সময় যখন নিকোলাস থাকে বাড়িতে।

আর সে বাড়িতে না থাকলেই বা কি ? সারা সংসারের মধ্যে ঐ জায়গাটুকু আগাথার কাছে পবিত্র তীর্থ—কেন না, তার নিকোলাস এর খুব কাছে থাকে। ঐ চলন-পথের শেষ প্রান্তে লতাগুল্মের দিকে আড়াল-করা একটু নিভৃত নিলয় আছে আগাথার। এ বাড়ির যে ঘরে নিকোলাস ছুটির দিনগুলি কাটায়, তার জানলাটি দেখা যায় সেখান থেকে। বছরের বাকি সময় তার মা থাকেন সে-ঘরে। মা যখন সে-ঘরে বাসা নেন ঘরের জানলা বন্ধ থাকে সারাক্ষণ, তোলা থাকে জানলার খড়খড়ি। কিন্তু নিকোলাস এলেই ঘরের বন্দিদশা কাটে। জানলার অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। ঝাঁঝাল রোদের সময়টুকু ছাড়া জানলার পাল্লা হাট করে খুলে রাখে নিকোলাস। উন্মুক্ত পল্লী-প্রকৃতির গন্ধবহ বায়ুকে নিয়ত জানিয়ে রাখে আমন্ত্রণ। আজ-কাল অবশ্য আর সোজাসুজি সে ঘরে উঠে যেতে সাহস হয় না

আগাথার। শেষ যেদিন গিয়েছিল সে, নিকোলাসের মা সিঁড়ির মুখে তাকে বড় রূঢ় কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

সুমুখের এক মুঠো ফাঁকা জমি পেরিয়ে বেড়ার ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকে পড়ল আগাথা। ওক গাছের নীচে যেখানটিতে সে বসে, সেখানে ঘাসের মখমল এখনও কোমল মসৃণ হয়ে আছে। ম্যাকিনটোশ পেতে আগাথা আরাম করে বসল মাটিতে। এখান থেকে নিকোলাসের ঘরের কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু পোশাক আলমারীর আরসীর ঝকঝকানিতে চোখ ধাঁধায়। ব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে পাতা খুলে বসল বটে আগাথা কিন্তু সে তো জানে, এই গৃহ-দেবালয়ের সান্নিধ্যে এলে কোন দিনই সে এক ছত্র পড়তে পারে না।

কী ভাগ্যবতী বলে নিজেকে সে মানল আজকে। হঠাৎই যেন আগাথা দেখা পেয়ে গেল তার মনের মানুষটির। এক লহমার বিরতি। পর পরই গিল্স এসে দাঁড়াল তার পাশে। জানলার শিক ধরে বন্ধুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল বন্ধু। দু'জনে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে বাগানের দিকে। হয়ত বলাবলি করছে—'ভিজে মাটির গন্ধ কি মিষ্টি লাগছে বল তো?' লেবু গাছের শুকনো পাতা থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ছিট্‌কে পড়ছে চারি দিকে। দুই বন্ধুতে পরস্পরের দিকে না তাকিয়েই কথা-বলাবলি করছে। মাঝে মাঝে প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাদের মুখ। ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে পরমানন্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে গিল্স। তার নিকোলাস কখনো সিগারেট খায় না। ধূম পান না করা তার বৈরাগ্য সাধনার অঙ্গ মনে করে সে। তার নিকোলাসের দেখাদখি আগাথাও আজ-কাল নেশা বর্জন করেছে। লুব্ধমতি শিশুর মতো শুধু চেয়ে থাকে আগাথা অহেতুক আনন্দে, কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের রসমধুর মিলন। আর পুলকে রোমাঞ্চিত হয় অকারণে। মর্মে মর্মে

জানে সে, যে ওদের আলোচনায় স্থান নেই তার। নিকোলাস তাকে ভাল বাসলেও স্থান পেত না সে। ঐ দুই বন্ধুর আসঙ্গ রহস্যের প্রাসাদপুরীতে তার দ্বার অবারিত নয়। একটা বেদনা-বিধুর কামনা নিয়ে তার মুগ্ধ নারী-মন শুধু লুব্ধ চোখে সেই অপার রহস্যময়তাকে মন্থন করতে চায়।

কামের চেয়ে সহজ কিছু নেই সংসারে। পাপের রহস্যই সব থেকে কম জটিল। মানুষের কলঙ্কের ইতিহাসে তার একদিনের স্বামীর পাপ অভিনব অভাবনীয় কিছু নয়। বিয়ের দিন রাত্রে কাম-সঙ্গিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সেই মামুলী কামবৃত্তিরই সাধারণ পুনরাবৃত্তি লেখা আছে। তার মধ্যে অনন্য অসাধারণ কিছু নেই। কিন্তু এই দুইটি তরুণের সঙ্গোপন মিতালির রহস্য রূপ স্বতন্ত্র। দুজনেই জানে, অনন্ত কাল ব্যেপে তাদের দুটি প্রাণের কুসুম জীবনবৃন্তে একসঙ্গে দোল খাবে—নিয়ত আসঙ্গের একঘেয়েমিত্বে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না কোন দিন। তাদের পঠনপাঠন চিন্তা-স্বপ্ন কামনা-বাসনা কিছুতেই বিচ্ছিন্নতা নেই। কথা না বললেও তাদের মনের বীণা এক সুরে বাঁধা। তাদের কথার পরিভাষা আলাদা—বর্ণমালা আলাদা যার মর্মার্থ শুধু তারা দুটিতেই জানে। এই অপার রহস্যের অস্তিত্বে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে আগাথা—তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অসহ্য আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় তার মন। বেদনার কণ্টকে জর্জরিত হতে থাকে সর্ব তনু।

পাতায় পাতায় প্রথম বর্ষণের টুপটাপ শব্দ আগাথার কানে যায়। বিরাট বনস্পতির আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে অবশ্য তার গা ভেজে না। বাগানের ঐ পারে দোতালার জানলার গায়ে গায়ে লাগা মাথা দুটি তার দৃষ্টিকে বন্দী করে রেখেছে। ওক গাছের গুড়িতে এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসে বসে তার পিঠ ব্যথা করতে থাকে। যে মাটি তার আশ্রয়,

তাও যেন কত কম কঠিন মনে হয়। এধারে ওধারে তাকে ঘিরে, তার চারি পাশে খরা রাস্তায় মাটিতে প্রথম বৃষ্টি-লাগা শিহরণের শব্দময় প্রতিধ্বনি ওঠে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নেয় আগাথা, একটি দুটি করে বৃষ্টির ফোঁটা তার কপালে পড়ে। গ্রীবার তট বেয়ে, দু কাঁধের সমতল উজিয়ে, বুকের উপত্যকা ভূমিকে সিক্ত করে। ওখানে দুই বন্ধু ছেলেমানুষের মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মাথার উপরের ঘন মেঘ বিগলিত ধারায় নামছে—তার স্নিগ্ধ পেলব স্পর্শ নিচ্ছে দু' জনে। এতক্ষণে উঠে ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ওক গাছের তলায় এসে দাঁড়াল আগাথা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার।

ভরা মেঘের ডম্বরু ছাপিয়ে বাজতে লাগল ঝরা বাদলের নূপুর-ধ্বনি। ওদের জানলায় কপাট পড়ল। তবু অন্ধকারের পটভূমিকায় তার নিকোলাসের ঘরের আয়নার উজ্জ্বল রেখাটুকু শুধু চোখে পড়ে আগাথার। শুধু মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে চলমান দুটি মূর্তির ছায়ায় সে স্থিরপ্রভা এক একবার আড়াল হয়ে যায়। তখন গানের সুরে আচম্বিতে পড়ে যতি।

॥ ৬ ॥

আগাথার ফেল্টের টুপি ভিজে সপসপে হয়ে উঠল রীতিমত। টুপিটা মাথা থেকে খুলে রুমাল দিয়ে জল ঝেড়ে ফেলল মাথার। তার সঙ্গে নিকোলাসের কত ব্যবধান! এক দিকে এই ক্ষান্তিহীন বর্ষণের বিভেদ প্রাচীর। আর ঐ দুটি তরুণের দুর্ভেদ্য মিতালির পরিখা-ঘেরা ঐ রুদ্ধদ্বার ঘর-বাড়ির রক্ষব্যূহ। তবু ঝড়-বাদলে বিপর্যস্ত এই রমণীকে সেই বিচ্ছেদ-বেদনা হতাশায় মুহ্যমান করে ফেলতে পারল না। বরং তাকে যেন সঞ্জীবিত করে তুলল নিষ্ক্রিয়তার কবর থেকে। পিঠটাকে ঋজু করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগাথা। আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে শাণিত করে তুলল নিজেকে।

যেদিন থেকে নিকোলাস তার দিন-রাত্রির ভাব-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করেছে, সেদিন থেকেই সে প্রতি ছুটির দিনে নিকোলাসের ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিজের দিন-রাত্রির রুটিন ঠিক করে নিয়েছে। রবিবার সান্ধ্য উপাসনা থেকে ফিরে এসে যতক্ষণ না মা শুতে যান ততক্ষণ অবধি সব সময়টুকু নিকোলাস তার মায়ের হাতে নিবেদন করে দিয়েছে। এক এক দিন রাত মনোহর হয়ে ওঠে। নিজের হাতে মায়ের গায়ে ওড়না জড়িয়ে দেয় সে। পুরোনো ধরনের একটি ব্রোচ লাগিয়ে দেয় তাতে। তার পর মায়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় বাগানে। মাতৃস্নেহের পবিত্র পাদপীঠে এ তার অপ্রত্যাশী অর্ঘ্যাঞ্জলি। এ কথা ভেবে আশ্চর্য তৃপ্তি পায় তার মন। যেদিন বৃষ্টি পড়ে, ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে বাগানে, মা-ছেলেতে জানলার ধারে বসে দাবা খেলে। কোন কোন দিন মাকে বই পড়ে শোনায় নিকোলাস। সাহিত্যে সে সুন্দরের পূজারী সেই সৌন্দর্যের বিচিত্র মধুর রূপ সে বোঝাতে

চেষ্টা করে মাকে। মাঝে মাঝে মা ছু'-একটি ছেলেমানুষী মন্তব্য করেন। পড়তে পড়তে এক সময় নাক ডাকার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে নিকোলাস। চেঁচিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। তখন মনে মনে পড়ার সময় আসে তার। সন্ধ্যার পর গিল্সও আসে না এ দিকে। মা-ছেলের মধ্যিখানে ভাগ বসাতে চায় না সে। এ সময় নিকোলাসকে একলা তার বাড়িতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সর্বাগ্রে বাড়ি গিয়ে তাকে পোশাক বদলাতে হবে, জুতা-জামা ছাড়তে হবে, চুল গুছিয়ে তুলতে হবে। যে মেয়ে স্বরূপা নয় তার পক্ষে পুরুষের মন হরণ করতে হলে রূপ সাধনাই হল একমাত্র বন্ধু—একথা আগাথার চেয়ে ভাল করে আর কে জানে? আরো আধ ঘণ্টা বাড়ি খালি পড়ে থাকবে।

মেরীর বাবা গেছেন তার ক্লাবে। মা-মেয়ে গেছে গীর্জায়!

দ্রুত হাতে প্রসাধন সেরে নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে আগাথা। মেরীর মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল, একটা চাপা গোঙানি কানে এল তার। শুনে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে গেল আগাথা। প্রসবের সময় বিলম্বিত লয়ে মেয়েরা যে ভাবে গোঙায় তেমনি আওয়াজ কানে আসতে লাগল ঘরের ভিতর থেকে। দরজা হাট করে খুলে দিলে আগাথা। দেখলে মাদাম জুতা-দস্তানা কিছুই খোলেন নি তখনও। হাঁটু বুকে গুজে এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছেন। আগাথাকে দেখে ত্রস্ত হাতে স্কার্টটা নামিয়ে দিলেন তিনি, যাতে ফোলা পায়ের ইস্ত্রীভাঙা কালো মোজাটা আগাথার চোখে না পড়ে। আর সরিয়ে ফেললেন চোখের নিমেষে কালো দাগ-লাগা নোংরা তোয়ালেটা।

—'এক যুগ পরে আবার সেই রোগটা চেপে ধরেছে। এখন একটু ভাল বোধ করছি। অবশ্য আফিমের আরক খানিকটা গিলেছি।

বুকের এই ভারটা যদি না থাকত, তাহলেও খানিকটা আরাম পেতাম।'

আগাথা তার নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলে। তার পর মাথার বালিসটা ঠিক করে দিয়ে সংযত সাবধানী কণ্ঠে বললে—'আর কোন আপত্তি শুনব না আমি। এখন থেকে আমি যেমন যেমন বলব, ঠিক তেমনি করতে হবে। এবার আমার হুকুম মানার পালা আপনার। ভাল ডাক্তার আসবেন বাড়িতে। যত্ন করে পরীক্ষা করে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করবেন।'

বলতে বলতে আত্মীয়তার দরদ ঝরে পড়তে লাগল আগাথার গলায়। সারা মুখে ছেলেমানুষী অবাধ্যতা নিয়ে ঠোঁট চেপে শুয়ে রইলেন মাদাম। অবশ্য মেয়ের গভর্নেসের কথায় সাড়া দিলেন না—না-ও করলেন না। পায়ের উপর পা শক্ত করে চেপে ধরে, পেটের উপর ছোট্ট হাত দু'খানি রেখে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। তখনও এক হাতে দস্তানা পরা। মাদাম হলেন সেই জাতের মেয়ে যারা শরীরের অসহ্য কষ্ট স্বীকার করবেন, তবু কোন পর-পুরুষের চোখের সামনে—হলই বা সে ডাক্তার—মেয়ে মানুষের শরীরের সেই সব লজ্জা-স্থান দেখাবেন না।

যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছিলেন না মেরীর মা। তার পা থেকে জুতো খুলতে খুলতে বললে অগাথা—'আগে ত কত বার আমার কত কথা শুনেছেন মন দিয়ে। নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা ছাড়া আরও কত কথা ত আমায় বলেছেন। কোন কিছুই ত গোপন করেননি কোন দিন আমার কাছে।'

মাদাম চোখ বুজে ছিলেন। এবার চোখ তুলে তাকালেন। কৌতূহলী সজাগ দৃষ্টি দিয়ে আগাথার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সত্যিই কি আগাথা ভালবাসে তাকে? তাকে যেমন

ভাবে এখানকার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সংস্কার-কুসংস্কারের কাছে মাথা নামিয়ে ভালো মেয়ে ভালো বৌ হয়ে চলতে হয়, এ মেয়ের ত সে সবের বালাই নেই। আগাথা বড় কঠিন মেয়ে মানুষ। হোক না তার মেয়ের গভর্নেস, তবু কাঁরাঁদের ঘরের মেয়ে ও। ওর মনের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। ওর বাঁচার পরিবেশে বুদ্ধিটাই বড়ো, জানতেন মাদাম। তবে কি সেই পাষাণী প্রতিমাতেও হৃদয়ের বালাই আছে নাকি? সে প্রাণের একটি নিভৃত কোণে তার গৃহস্বামিনীর জন্যে একটু স্নেহ-প্রীতি আছে লুকানো? মুহূর্ত কালের জন্যে সেই পরিণত বয়সী রমণীর স্বেদসিক্ত হাতের মুঠোয় আগাথার শীর্ণ বিশুষ্ক হাত ধরা পড়ে গেলো।

—'অত উতলা হবার কিছু নেই। ভেবে মন খারাপ করবেন না। আমার মা-ও ঐ রোগে ভুগতেন। চিকিৎসার মধ্যে গরম সেঁক দিতে দেখেছি তাঁকে। ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু বেঁচেছিলেন চুরাশী বছর পর্যন্ত। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি মায়ের আমার এই গর্ব ছিল যে জীবনে একবারও ডাক্তারের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। যে সব জিনিস পরপুরুষকে দেখানো মেয়েদের সব থেকে লজ্জার, সে-লজ্জা থেকে ভগবান তাঁকে বরাবর বাঁচিয়েছেন।'

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মাদামের বুকের ভেতর থেকে। ফিসফিস করে বললেন—'এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে। যদি গীর্জায় যাও মেরীকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।'

আগাথা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বললে—'আমরা ে মেরীর ভাবভঙ্গীর উপর নজর রেখেছি এ যেন ও কিছুতেই না বুঝতে পারে। ওর সরল বিশ্বাস হারানো আমাদেরই লোকসান।'

—'তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। যা তুমি করবে ওর

পক্ষে সেইটাই হবে সব থেকে মঙ্গলকর, সে-বিশ্বাস আমার আছে। আমাকে ও শত্রু মনে করে। এই মহা সর্বনাশ এড়াতে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। কে জানে ভগবানের কি অভিপ্রায়? যদি তিনি আমায় টেনে নেন—'

—'অমন কথা মুখে আনবেন না—'

—'কেন জানি না, ভাবতে ভারি ভালো লাগে যে, যেদিন আমি থাকব না, এ সংসারে এখানকার কোন-কিছুর রং বদল হবে না। মেরী আমার—'

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মাদাম—ঠোঁট চেপে পড়ে রইলেন। আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। একদিন এই চিন্ময় শরীর প্রাণহীন পুতুল হয়ে পড়ে থাকবে—তারই ষ্টেজ রিহার্সেল দিচ্ছেন যেন! একটু পরে আবার চোখ মেলে তাকালেন—আগাথার দিকে চেয়ে করুণ হাসি হাসলেন তিনি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। এমনি ধারা অসুস্থতার পর ঘুমে অবসন্ন হয়ে আসে দেহ। আগাথা বসে রইল মাদামের পাশে যতক্ষণ না তার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। মাদামকে শান্তিতে ঘুমোতে দেখে উঠে পড়ল আগাথা। জুতোটা মচ-মচ করে উঠল। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে আগাথা।

এ বাড়ির জীবনধারার এই নিত্য-নৈমিত্তিকতার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে সে। এর একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি আজ-কাল গা-সওয়া হয়ে গেছে। সান্ধ্য উপাসনা শেষ না হওয়া অবধি নিকোলাসের মা গীর্জায় বসে থাকেন। আর বাড়িতে গিল্‌স বন্ধু নিকোলাসকে আঁকড়ে বসে থাকে।

এখন গিল্‌সের বাড়িতে যাওয়া একটু সকাল সকাল হয়ে পড়বে। তাই গীর্জার দিকে পা বাড়াল আগাথা। পাশের দরজা দিয়ে গীর্জার

ভিতর ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যা আরতির পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। তাঁর স্তোত্র পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত উপাসকের দলও যাজকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সাড়া দিল। তাদের কণ্ঠস্বর গীর্জার ছাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম-গম করতে লাগল সারা ঘরে। রাতের আহারের দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে উপাসকমণ্ডলীর সাড়ায় আজ যেন একটু বেশী চঞ্চলতা প্রকাশ পেল।

একটা থামের আড়ালে বসে অপেক্ষা করছিল আগাথা। উপাসনায় মনকে বশ করার জন্যে জাঁনু পেতে বসতে উৎসাহ ছিল না তার দেহ-মনে। এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। আগাথাকে তার কুলধর্ম মেনে চলার অধিকার দিয়েছেন মেরীর মা বাবা। তাদের কুলাচারে শুধু ইষ্টারের সময় শাস্তি নেওয়া নিয়ম। কিন্তু আগাথা তার কুলধর্মও মেনে চলে কিনা সন্দেহ! লোকে যদি তাকে নাস্তিক বলে, তাতে তার লজ্জা ত নেই, বরং বেশ যেন গৌরব বোধ করে সে। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে চলতেই তার আনন্দ। তার দৃঢ় ধারণা, এত দিনে হারিয়ে ফেলেছে সে ধর্মে বিশ্বাস। কখনো কখনো সন্দেহই হয় সত্যিই কি স্খলিত হয়েছে সে ধর্মাশ্রয় থেকে? সত্যিই কি একদিন ছিল তার ধর্মে বিশ্বাস? অত চুলচেরা দার্শনিকতা ভালও লাগে না আগাথার। ভগবানের সঙ্গে তার সব যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। তার প্রাণের ভগবানের কথা আর কানে শুনতে পায় না সে—তার কাছে তার কোন আবেদনও নেই।

আগাথার ধারণা, রূপের ব্যাপারে স্রষ্টা ভগবান অবিচার করেছেন তার প্রতি। কে একজন ধর্মযাজক বলেছিলেন—ভগবানের সৃষ্টিতে এই অবিচারের বিরুদ্ধেই মানুষের চিরকালের বিদ্রোহ। কি হবে উপাসনায়। হাজার উপাসনা করলেও তার চেহারা সুন্দর হবে

না। পীনোদ্ধত হবে না তার বুক। যার প্রাণের কুসুম মঞ্জরিত হল না, ভগবান কৃপণ হাতে রূপ দিয়েছেন যাকে, ঈশ্বরপ্রেম তার প্রাণের আকাশে কেমন করে বিকশিত হয়ে উঠবে সহজে?

যতক্ষণ না গীর্জা খালি হয়ে গেল, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল আগাথা। পাথরের অরণ্যে বৃদ্ধ পর্যুদস্ত সিংহের মত বিরাট অর্গানটা থেকে থেকে আর্তনাদ করছে। শ্বাসক্লিষ্ট রোগীর মত শাঁই-শাঁই আওয়াজ উঠছে তার গলা থেকে। ঐ অর্গান ভাল করে সারাতে অনেক খরচ। সে যত দিন না হচ্ছে তত দিন ঐ আর্ত গোঙানিও বন্ধ হবে না গির্জায়।

॥ ৭ ॥

আপন চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে পথ চলছিল গিল্‌স যে জনশূন্য বুলেভার্দ পেরিয়ে বাড়ির দরজা অবধি পৌছান পর্যন্ত খেয়ালই ছিল না তার কোথায় সে যাচ্ছে। গেটের বাইরে তার বাবা গাড়ির ষ্টার্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বৃথাই অচল গাড়িটাকে সচল করার চেষ্টা করছিলেন। হ্যাণ্ডেল রেখে যখন পিঠ সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন, গিল্‌স দেখলে বাবার মুখ-চোখ পরিশ্রমে রক্ত-জবা হয়ে উঠেছে।

ঘাড়ে-গর্দানে একাকার মানুষটি।

—'সেলফ ষ্টার্টারটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—' রাগে গজ-গজ করছিলেন ডাক্তার।

—'দাও আমি হ্যাণ্ডেল মারছি'—বলে এগিয়ে এল গিল্‌স।

একটা চাষা ছেলে ঠাকুমার অসুখের জন্যে ডাক্তারকে নিতে এসেছিল। ঠাকুমার যে কিসের অসুখ—কেমন ধারা অবস্থা, তার কিছুই জানে না ছেলেটা। বলতেও পারলে না ডাক্তারকে।

—'মরে যায়নি ত তোর ঠাকুমা? এটুকু খবরও ত দিতে পারতিস আমায়? বার মাইল ঠেঙিয়ে নিয়ে যাবি—গিয়ে হয়ত দেখব একটা মড়া পচছে ঘরে। এতক্ষণে তোর ঠাকুমা ঠিক মরেছে।'

ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ডাক্তার—'ওদের ঐ ধারা।'

—'তবে যাচ্ছেন কেন বাবা? কোন দিন কোন খানা-ডোবা থেকে আপনাকেও তুলে আনতে হবে আমাদের—' প্রীতি-হীন কণ্ঠে বাবাকে সতর্ক করলে গিল্‌স।

—'সেই রকমই অপঘাত কপালে ঘটবে কোন দিন। ওঃ, বলতে বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কে একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ড্রয়িং-রুমে অনেকক্ষণ বসে আছে। তা হবে বই কি, আধ ঘণ্টা হবে। আমার কলের পর এবার তোমার কল এল।'

—'কে বাবা? চেনা মানুষ?'

—'আগে ভাগে বলে দিয়ে রহস্য ভাঙতে চাইনে আমি। মনের কথাই যদি বলতে এসে থাকে মেয়েটি, আমি মোটেই আশ্চর্য হব না। যাও যাও, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে তাকে—' হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার।

হাসলে ডাক্তারের দুটি চোখই মেদের নীচে চাপা পড়ে যায়।

ঘাসে-ঢাকা এক মুঠো প্রাঙ্গণ ছুটে পেরিয়ে গেল গিল্‌স। ডিঙিয়ে গেল ফুল-বাগিচার বেড়া। হয়ত সান্ধ্য ভজনের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তার মেরী এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই ভুল ভাঙল তার। যে মেয়েটি পুরোনো মাসিক পত্রিকার উপর ঝুঁকে বসে আছে সে তার প্রত্যাশার ধন মেরী নয়। গিল্‌স ঘরে ঢুকতেই আগাথা উঠে দাঁড়াল। সৌজন্যের সঙ্গে দু' জনে করমর্দন করল তারা।

অতিথিকে বসতে ইংগিত করলে গিল্‌স, কিন্তু নিজে রইল

দাঁড়িয়ে। দুটি শীতল চোখের শাণিত দৃষ্টিতে খণ্ডিত করতে লাগল সেই রমণীকে।

যে কথাটা বলতে এখানে আসা কি ভাবে তা সুরু করবে, ঠিক করেই এসেছিল আগাথা। এখন সেই কথাটাই স্মরণ করতে লাগল আবার। গিল্‌সদের এই বাইরের ঘরে পিয়ানোর উপর ঝোলান বাসর-সভার ছবির মধ্যবর্তিনী গিল্‌সের মায়ের সজাগ সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় বসে আধ ঘণ্টা ধরে সে সেই সংলাপ রচনায় তালিম দিয়েছে নিজেকে। কয়েক মাসের শিশু রেখে গিল্‌সের মা স্বর্গগতা হন। মৃতার স্মরণে তাঁর নিজের হাতে সাজান এ সংসারের একটি জিনিসও বদল হ'তে দেবেন না এই ছিল স্বামীর প্রতিজ্ঞা। সেই সহস্র স্মৃতি রোমাঞ্চিত পরিচিত পরিবেশে বিচ্ছেদ বেদনার অনেকখানি লাঘব হয়েছিল তার। শান্তিও খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। সেই পুরাকালের আরাম কেদারায় এখনো পুরোনো ফ্যাশানের ক্রোচেট কাজ করা আবরণী লাগান। জানলার পর্দাগুলো এখন ছিন্ন কন্থায় দাঁড়িয়েছে। একটি তরুণী বধূর সংসার রচনার সযত্ন প্রীতিতে সাজান সেই পর্দার পাড়গুলি এখনো অতীত দিনের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। বসে বসে এতক্ষণ তাই দেখছিল আগাথা।

—'আমার এখানে আসার কারণটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন ?'

সে কথায় সায় দিয়ে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে গিল্‌স। তার ভালো-মন্দের জন্যে ওপর-পড়া হয়ে কিছু করবে গিল্‌স, নিশ্চয়ই সে রকম কোন ধারণা করে বসে নেই আগাথা। কোন দিনই কারুর জন্যে কিছু করার মানুষ নয় সে। তবে এই বিশেষ মেয়েটির বেলায় তার স্বভাবের ব্যতিক্রম করতে আপত্তি নেই গিল্‌সের। কেন না, যাকে পাওয়ার জন্যে হৃদয় মন তার ব্যাকুল অস্থির হয়ে আছে, তাকে পেতে হলে আগাথার সাহায্য দরকার হতে পারে। দোর্থের মত পর্দানসীন

জায়গায় মেয়ে মানুষের ঘটকালি ভিন্ন কোন অবস্থাবান ঘরের মেয়ের সঙ্গে গোপন মিলন ঘটানো একেবারে অসম্ভব। তা ভালো করেই জানে গিল্‌স।

মালিনী যেমন সযত্নে কুসুম চয়ন করে মালা গাঁথে, তেমনি নিপুণতার সঙ্গে প্রতিটি কথা যাচাই করে আগাথা উদ্‌ঘাটিত করতে লাগল নিজেকে। শান্ত কুশলী কণ্ঠে রচনা করতে লাগল বীতংস।

মেরী ডুবের্নের শিক্ষার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর। আপনি এখানে আসা অবধি তার মনে আর শান্তি নেই।'

একের পর এক আগাথা পেশ করতে লাগল তার মন্তব্য। যাই ঘটুক, আগাথাকে চটিয়ে দেওয়া চলবে না কোন মতেই—মনে মনে স্থির করে রাখলে গিল্‌স। আগাথাকে চোখে দেখলেই তার মনে যে বিপ্রকর্ষণের সৃষ্টি হয় সে-ভাব ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হবে না এ মেয়েকে। যে সব মেয়েরা দেহ-লাবণ্যে মনে বাসনার আগুন জ্বালায় না তাদের সোজা ঘৃণা করে যে জাতের ছেলেরা, গিল্‌স হল তাদেরই একজন। পাছে মনের বিতৃষ্ণা গোপন করতে না পারে সেই ভয়ে কণ্টকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিল্‌স। ঠোঁট চেপে রইল, যাতে কোন অন্যমনস্কতায় বেফাঁস কিছু প্রকাশ হয়ে না পড়ে মুখ দিয়ে।

অনেক কথার শেষে আগাথা মিনতি করে বললে—'আপনার কাছে আমার এ আবেদন মনে যখন—'

এতক্ষণে কথা বলার প্রথম সুযোগ পেল গিল্‌স। পরম ঔদাস্যের সঙ্গে বললে—'মন! মনের কোন বালাই নেই আমার!'

শুনে অধীর কণ্ঠে বললে আগাথা—'এমন কথা বিশ্বাসই করি না আমি।'

—'বিশ্বাস করার কথাও নয়। তবে আপনি যে অর্থে বলেছেন সে অর্থে নয় নিশ্চয়—'

কথা বন্ধ করে আগাথা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল গিল্‌সকে। তার সে সন্ধানী চাউনি সহ্য করতে না পেরে গিল্‌স ঝপ করে তার মুখোমুখী হয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর চেয়ারটাকে টেনে আগাথার এত কাছে নিয়ে এল যে, তার হাঁটু মেয়েটির স্কার্টের প্রান্তে ছুঁই-ছুঁই করতে লাগল।

—'হঠাৎ আমার এখানে উদয় হওয়ার কারণটা কি? সত্যি, কেন এলেন বলুন ত?'

আচ্ছা অর্বাচীন ত—ভাবতে ভাবতে আগাথা চেয়ারটাকে পিছিয়ে সরিয়ে বসল। গিল্‌সের মত পুরুষ তার নারী-চিত্তে কোন মহৎ প্রীতি সঞ্চারিত করতে পারে না। তাকে ঘৃণাই করে আগাথা। গিল্‌সের মধ্যে যে একটা শিথিল পৌরুষ আছে তা এক মুঠো একটা মেয়েকে নবীন প্রেরণায় জাগিয়ে দিতে পারে হয়ত। কিন্তু আগাথার সবল নারী-হৃদয় অমন পুরুষকে অবলীলা ক্রমে অবহেলা করতে পারে।

—'আপনিই পারেন—শুধু আপনিই পারেন মাদাম দুবের্নেকে প্রভাবিত করতে'—বললে গিল্‌স—'জানেন আপনার সঙ্গে নিকোলাস কার তুলনা করে?'

শুনে গোপন অনুরাগিণীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। তবে তার কথা ভাবে নিকোলাস। কারুর সঙ্গে তুলনা করার কথাও মনে আসে তার। এ ভাবনার পুলকে রোমাঞ্চিত হতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

—'বলে আপনি গ্যালিগাই—সে কেমন ধারা মেয়ে আপনি জানেন বোধ হয়?'

—'জানি বই কি'—হেসে বললে আগাথা—'গ্যালিগাই সেই মেয়ে যে মেরী ছ মেডিসিসকে সম্মোহিত করেছিল। গ্যালিগাই! মোহিনী

বিদ্যায় পারদর্শিনী বলে যখন তাকে অভিযুক্ত করা হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে বলেছিল—‘আমার সম্মোহন বিদ্যা গোপন যাদু কিছু নয়। দুর্বল চিত্তের উপর সবল মনঃশক্তি প্রয়োগই আমার সম্মোহন। তাই না? তবে মেরী দুবের্নের মাকে যদি দুর্বল মন ভেবে থাকেন, মস্ত ভুল ধারণা করে বসে আছেন, জানিয়ে রাখলাম।’

—‘তা হোক, আপনি ত দুর্বল নন?’

—‘কি জানি হয়ত—’

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে আগাথা। তার পর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কাটিয়ে বললে—‘নিকোলাসদের মত মানুষদের শান্ত চেহারা বড়ো প্রবঞ্চনা করে। ওরা মোটেই দুর্বল পুরুষ নয়।’

—‘কিন্তু আমার ওপর ওর আসক্তির অবধি নেই—’ বলে উঠে দাঁড়াল গিল্‌স।

ঝড়ের সময় ঘরের জানলা বন্ধ করে রেখে গেছে চাকরেরা। গিল্‌স উঠে জানলা খুলে দিতে গেল। নীচু কণ্ঠে বিড়-বিড় করে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললে সে—‘এই সব রক্তহীন ফ্যাকাশে মেয়েগুলোকে দু' চোখে দেখতে পারি না। যতই সাজ প্রসাধন করুক—অরুচি—অরুচি—।’

ভিজে পেটুনিয়ার মদির গন্ধ বুক ভরে টেনে নিল গিল্‌স। আগাথাও নিশ্চয়ই কোন গালভারী উত্তর ভাঁজছে ভাবলে সে। কিন্তু ভুল তার ধারণা। ‘ও আমার ভারি অনুরক্ত’—এই কথাটাই আগাথার বার বার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। সালেঁাদের এই ছেলেটার আশ্চর্য প্রভাব নিকোলাসের উপর। যদি কোন দিন নিকোলাস তাকে বিয়ে করার কথা মনে স্থান দেয়, সে শুধু তার এই বর্বর বদমেজাজী বন্ধুকে খুশী করার জন্যেই। অমন ছেলে সব সময় ফোঁস করার জন্যে ফণা উঁচিয়ে আছে। অনেক

এলোমেলো চিন্তার রাশ টেনে অবশেষে বললে আগাথা—'আমরা দু'জনে দুই বিপরীত পরিবেশে এসে পড়েছি। মেরীর মন পাওয়ার জন্যে কোন অনুনয় আবেদনের দরকার নেই আপনার। তার মনের নাগালে পৌছতে বাইরের বাধাটুকু ঠেলে সরিয়ে দিতে পারলেই আপনি জিতে যাবেন। কিন্তু আমার—'

—'বলছেন বটে—তবে আমিই যে নিশ্চিত সফল হব এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি কই—'

তার গাল দুটোতে আগুন ঝাঁ ঝাঁ করছে স্পষ্ট বোধ করলে গিল্‌স। সেটুকু গোপন করতেই বুঝি উঠে দাঁড়াল সে। এই রূপহীনা কুৎসিত মেয়েটা কি মনে মনে ভাবছে যে গিল্‌স তার প্রাণোপম বন্ধুকে উপহার দেবে এর পায়ে? হাত-পা বেঁধে আহুতি দেবে এর কামনার হুতাশনে? মেরীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধটা একবার পাকাপাকি হয়ে গেলেই আগাথার লুব্ধ দৃষ্টির সামনে সমাপ্তির যবনিকা টেনে দেবে সে। একটি মুহূর্ত দেরী করবে না। এই অমানিতা মানবীর যূপমূলে নিকোলাসকে কিছুতেই বলি দিতে পারবে না সে।

বৃষ্টিভেজা পেটুনিয়ার গন্ধবহ এই সমীরণ তার মনে চকিত মুহূর্তের স্মৃতিকে শাশ্বত করে রাখবে। মনে থাকবে যে একদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বন্ধুকে হীন ভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল সে মনে মনে। হঠাৎ তার মনে হল, এ পৃথিবীতে নিকোলাসকেই সে সব চাইতে বেশী ভালবাসে। হয়ত সেই একমাত্র মানুষ, যাকে সে ভালবাসে। ঘরের কোণে যে মেয়েটি বসে আছে তার কথা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়ে গেল গিল্‌স। আগাথা যেন তার নিভৃত সুখের জগতে অবাঞ্ছিত অতিথি। অনেকক্ষণ পরে আবার সম্বিৎ পেয়ে ফিরে দাঁড়াল গিল্‌স। বেশ কিছুক্ষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে

লক্ষ্য করলে আগাথাকে। তারপর বললে—'কবে কখন দেখা হবে তার সঙ্গে? মেরী—মেরীর দেখা কবে পাব?'

'—পাগল! মেরীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখন ত নয়ই। ভারী ছেলেমানুষ ত আপনি?'

গিল্‌সের দিকে চেয়ে হাসল আগাথা।

যা বলতে তার আসা, সব শেষ হল বলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে আগাথা। অসুখী মনে গিল্‌স সেই রমণীর সৌজন্যের উত্তর দিলে। আঙুল দিয়ে তার আঙুল ছুঁলে মাত্র।

—'আমায় খুব নির্বোধ মেয়েমানুষ ভাবলেন ত আপনি?'

মুখ লাল করে অন্য দিকে তাকাল গিল্‌স।

তার মনের গভীর তল অবধি দেখে নিয়েছে ঐ মেয়েটা। দেখে নিয়েছে সব রহস্য ভেদ করে। বলার আর কিছু বাকি রইল না। জীবনের সর্বশেষ কথাটির প্রয়োজনও বুঝি ফুরিয়ে গেল।

বিনা আলোতেই দুবের্নেরা সমুখের বাগানে খেতে বসেছিল। বিরাট টিউলিপ গাছের শাখায় বিচ্ছুরিত হয়ে মাটিতে আলো-ছায়ায় জাজিম বিছিয়েছে জ্যোৎস্না। মাখনের বাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে সময় কাটাচ্ছিলেন মেরীর বাবা। চেয়ারে অধীর আগ্রহে মেরী যেন অলক্ষিত ডানায় ভর দিয়ে কার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসেছিল। মা বোধ হয় তাকে সন্দেহ করেছিলেন, তাই আগাথার ঘরে যেতে না যেতেই মা-ও সদ্য সদ্য সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বলতে গেলে আগাথার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি তার।

এদের সবাইকে সচকিত করে মেরীর বাবা হঠাৎ একটা প্রশ্ন পাড়লেন। তিনি এতক্ষণ আপন গভীরে চিন্তামগ্ন ছিলেন। এরা সবাই ভাবছিল মানুষটি নিঃশব্দে নিশ্চিন্তে গুরুভোজন পরিপাক করছেন।

—'পত্রিকার ঐ টুকরো লেখাগুলো পড়েছিলো না কি আগাথা ?'

মেরীর মা ঝনাৎ করে বলে বসলেন—'আজ যা ঠাণ্ডা পড়েছে—আমি তো শীতে হিম হয়ে যাচ্ছি।'

আজ থেকে পনেরো বছর আগে যখন মেরীর বাবার বয়সের জোয়ারে ছিল টান, মনে-প্রাণে এমন করে এলিয়ে পড়েনি কর্মশক্তি, তখন স্ত্রীর এই ধরণের অসতর্ক অনধিকারী কথাবার্তাকে তিনি রূঢ় ব্যঙ্গে ধাক্কা দিতেন। ওড়া পাখির ডানা কেটে দেওয়াই জুলিয়ার কাজ। আলাপের আকাশে মুক্তপক্ষ ভাবের লীলাকে ভূমিশায়ী করার কৌশলে ঐ মেয়েটির অনবদ্য নিপুণতা। এখন আর আগের মত আগ্রহ নেই মনে, তাই সামান্য বাধায় ক্লান্তি জড়িয়ে আসে। আজও তাই হল। কথার সূত্র ছেড়ে মানুষটি আবার আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন।

মেরীও উঠে পড়েছিল, মা তাকে ডাকলেন।

—'আমি যতক্ষণ না বলছি তুমি এখান থেকে এক পা-ও যাবে না মেরী।'

নিরঙ্কুশ ভাল মানুষের মত মেরী আবার বসে পড়ল যথাস্থানে। বাবা মদের গ্লাস নামিয়ে রেখে গোঁফের উপর রুমাল বুলিয়ে নিলেন।

ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে একটি সিগার বের করে আঙুলের ফাঁকে কড়-কড় করে ফেরাতে লাগলেন। বললেন—'আমার জন্যে তোমাদের বসে থাকার দরকার নেই। কোন দরকার নেই বসে থাকার।'

বাবার কথা শেষ হবার আগেই মেরী দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেল। আগাথাকে তার বলাই আছে—'ছাতের অলিন্দে দেখা হবে।' কিন্তু আগাথা সহজে উঠল না সেখান থেকে। মেরীর মা তাকেও সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন জানে সে। মেরীর মা বোধ হয় ভেবেছেন যে এদের দুটির মধ্যে কোন লুকোচুরি আছে। কিন্তু তক্ষুণি ভুল ভাঙ্গল আগাথার।

মেরীর মা বললেন—'আমি শুয়ে পড়তে যাচ্ছি। ব্যথাটা অনেক কমে এসেছে বটে কিন্তু শরীরে বড়ো ক্লান্তি বোধ করছি। মেরীকে তুমি একলা রেখ না আগাথা। কি জানি ছেলেটা হয়ত আমাদের ছাতের নীচে নদীর ধারে ঘূর-ঘূর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও বয়সের ছেলেদের স্বভাবই হল ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান।'

মেরীর মা চলে যাবার পরে আরও একটুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে আগাথা। তার পর মেরীর বাবাকে অনেকটা সান্ত্বনার সুরেই বললে—'অমন অবুঝ হলে কি চলে? মেয়েটার দিকেও ত আমার নজর রাখতে হবে। এখন আমি যাই—কেমন?'

ঠিক এই মুহূর্তে আগাথাকে আটকে রাখার কোন চেষ্টাই করলেন না তিনি। নিঃশব্দে গর্জন করতে লাগলেন বসে বসে, কেন না, আগাথা থাকবে তার কাছে এই প্রত্যাশায় চুরুটটা নিবে যেতে দিয়েছিলেন।

অন্ধকারে সাড়া দিলে মেরী—'এই যে মাদাম আমি।'

পাঁচিলের ধারে মেরীর গায়ে হেলান দিয়েই দাঁড়াল আগাথা।

দিগন্তপারে চন্দ্রকলা। এখনও জ্যোৎস্নালোকে নদীজল দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। তীরের ঘাস-বন আর অলডারের সারি থেকে একটা শীতল বাতাস উঠে আসছে উপরে।

মিনতি করে বললে মেরী—'আর আমায় প্রতীক্ষায় রেখো না মাদাম।' বলো কি হল আজ। বড় উতলা হয়ে রয়েছি।'

আগাথার বুকের ভিতর মুখ দিয়ে সোহাগ করতে লাগল অনুরাগিণী। যেন ও তার সঙ্গিনী নয়। নির্জন অন্ধকারে হঠাৎ পাওয়া তার প্রেমের পুরুষ। এই তো এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি আগাথার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—কথা হয়েছে।

—'কত দুষ্টুমিই তুমি জানো?'—অন্ধকারে মৃদু হাসল আগাথা।

মন কত লঘুভার বোধ হচ্ছে। যেন কিসের কমনীয়তা সঞ্চারিত হচ্ছে তার প্রাণপদ্মে। এ তার সুখ নয়—আসন্ন সুখের সম্ভাবনাও নয়। সুখের প্রত্যাশা থাকলে কখন তার মনের হিমতুষার দ্রবীভূত হয়ে ঝরে পড়ত বিগলিত ধারায়। পাষাণী আগাথাকে ভয় করে না কে এদের সমাজে? কিন্তু সে মেয়েও যে দিন মনের মানুষ পাবে, সে দিন কতো কান্নাই না কাঁদবে সে। যেদিন পুরুষের বাহু তাকে পরম আগ্রহে আবদ্ধ করবে আলিঙ্গনে, আর ব্রীড়াময়ী নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প্রেমিকের কাঁধে মাথা রেখে হবে পুলকিততনু, সেদিন নয়নের প্রেমাশ্রুধারায় তারও সব রূঢ়তা কঠিনতা ধুয়ে মুছে যাবে। পূর্ণতায় সার্থক হবে তার আত্মনিবেদন।

—'বলার কিছু নেই মেরী'—বললে আগাথা—'সে তো স্বপনে জাগরণে তোমার রূপ জপ করছে নিশি-দিন। আশা-নিরাশায় দোল খাচ্ছে মন তারও। এইটুকু খবরই তোমায় আমি দিতে পারি এখন।'

বলতে বলতে তফাতে সরে দাঁড়াল আগাথা। মর্মরিত কণ্ঠে বললে—'তোমার মা আসছেন।'

তবে যে বললেন তিনি ঘুমুতে যাচ্ছেন? এদের দুটিকে এক জালে আটকে ফেলতে চান নাকি? তার সন্দেহ সত্যি কি না তাই কি পরীক্ষা করতে এলেন এই ভাবে?

মেয়েকে ডেকে বললেন মা—'তোর জন্যে একটা গরম জামা নিয়ে এলাম। গায়ের শালটা মোটে গরম নয় তোর। ওটা আগাথাকে দিয়ে এইটে গায়ে দিয়ে নে।'

দু'জনের মাঝখানে এসে ছাতের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মা। সন্দেহ না ভালবাসায় কিসের বশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি, এরা দু'জনে কেউ-ই বুঝতে পারলে না। কথায় তো কিছুই প্রকাশ পেল না।

—'আজ মেঘ-কুয়াশার লেশ নেই আকাশে'—বললেন মা—'চাঁদের জ্যোতির্মালা অবধি হয়নি। আর এক পশলা বৃষ্টি হলে কার কি ক্ষতি হতো বল তো? মাটি শুকিয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে। এই সব ঝিরঝিরে বৃষ্টির জলে কি সে পাথর ভিজে নরম হয় কখনো? কি? কি যেন বললে কে শুনলাম?'

একটি কথাও উচ্চারণ করলে না মেরী। আজ মা তাকে কাছ-ছাড়া করবেন না স্থির করেছেন। ছাতে এই ভাবে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বরং ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া ভাল। রাতের মত শেষ চুমু দিতে আগাথা এক সময় তার ঘরে আসবেই—তখন বরং কথা কওয়ার সুযোগ পাবে মেরী।

শহরের ঠিক বাইরে দুই বন্ধুতে দেখা করার কথা ছিল আজ রাত্রে।

আকাশমুখী হয়ে হাঁটছিল নিকোলাস। নিরালোক জগতের জীব সে। আজকের এই চন্দ্রালোকিত নিদাঘ রজনীর পটভূমিকায় উন্মোচিত জ্যোতির্জগতের যে অপার রহস্য, সে তার বহু দিনের চেনা। তবু আজ এই রাত্রে সেই পরিচিত রসলোকের সন্ধানী

নয় সে। চারি পাশের ঝরা পাতার মরমরানি কিংবা দূরান্তে কোন কুকুরের চকিত ডাকার প্রতিধ্বনি অথবা কাক-জ্যোৎস্নায় বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত কুক্কুট রব—আজ সবই তার শ্রবণলোকের অতীত। কঠিন মৃত্তিকাস্তূপের উপর বন্ধু গিল্‌সের ভারী বুটের শব্দ তার নিজের পদধ্বনির সঙ্গে সমছন্দে ছন্দিত হচ্ছিল, তাই দু' কান ভরে শুনছিল নিকোলাস। চাঁদ তাদের পিছনে বলে দুটো বিলম্বিত ছায়ামূর্তি অগ্রগামী। কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো একাকার। যেন এক অদৃশ্য অনির্বচনীয় রহস্য-সূত্রে গ্রথিত তাদের এই চলার পথ। মাথার উপরে তারা-ভরা যে আকাশ—তারই কোন একটি নক্ষত্রমণ্ডল যেন তাদের জীবন—ভাবলে নিকোলাস।

অবিশ্রান্ত কথা কইছে গিল্‌স। বিরাম বিরতিহীন। আজ রাত্রে ভগবানের বিশ্বভুবন জুড়ে যে বাণীহীন বিপুল শান্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, গিল্‌সের যতিহীন ধ্বনি-হিল্লোলে সে সমুদ্র মৃদু তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। চেতনার অন্তর্লোকে অবগাহী তার মন কান পেতে শুনছে সেই বিক্ষেপ ধ্বনি।

কথা যখন শেষ হয়ে আসবে তখন গিল্‌স তাকে কি প্রশ্ন করবে তা জানে নিকোলাস। আর সে প্রশ্নে বন্ধুকে নিরাশ করে না তাকে বলতেই হবে। নিজের ধৈর্য দিয়ে সে মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করতে চাইছিল নিকোলাস।

—'চিরকালের জন্যে তোমার মনে একটা দৃঢ় মূল ধারণা জন্মে গেছে যে অন্য কাউকে ভাল বাসতে পারি না আমি। সেই জন্যে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাও না যে, মেরীকে আমি ভালবাসি। এ ভালবাসায় তোমার বিশ্বাস নেই—ভালবাসা কি তা তুমি সম্ভবত জানোও না। আসলে প্রেমের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তোমার জীবনে। কবিতাকে তুমি ভালবাসো, বন্ধুত্ব আর কবিতা নিয়ে

তোমার মনের প্রয়োজন মিটে যায়। আমার একার ভালবাসাতেই তোমার তৃপ্তি হয়, তাই আর কাউকে তুমি চিনতে চাও না—পেতেও চাও না। বলো, এই তোমার মনের কথা কিনা?'

বন্ধুর উত্তর শোনার ধৈর্য অবধি নেই গিল্‌সের। আপন মনেই সে বলে চলে—'আমি যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরমুখী হব, তা তুমি চাও না। তার জন্যে অবশ্য তোমায় আমি দোষ দিই না। আমার জীবনে কোন মেয়ে এলে আমাদের বন্ধুত্বটি আর এখনকার মত থাকবে না, এই তোমার ভয়।'

'কী বলছ তুমি গিল্‌স'—এর অতিরিক্ত আর কিছু বলতে পারলে না নিকোলাস।

কথা কইতে কইতে দু'জনে নদীর ধারে পথের মোড়ে এসে পড়েছিল। সেইখানে ব্রীজের উপর দাঁড়াল দু'জনে। নদীর ধারে এমনি করে দাঁড়িয়ে ছল-ছল প্রবাহিত জলের গন্ধবাহী বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে কত ভাল লাগে। পকেট থেকে সিগারেট বার করলে গিল্‌স। লাইটার জ্বালিয়ে সেটিকে ধরিয়ে নিলে। সেই ক্ষণ-প্রভ আলোকে গিল্‌সের তরুণ মুখের অনেকখানি চোখে পড়ল নিকোলাসের। চোখে পড়ল কপালের সেই কটি পরিচিত কুঞ্চন; অধরোষ্ঠের দুই প্রান্তে দুটি অর্ধবৃত্তের ইঙ্গিত। নরম গালে নবীন পৌরুষের কলঙ্করেখা।

মুহূর্ত মধ্যে সে জ্যোতিকণা নির্বাপিত হল। তখন জ্যোৎস্না-লোকে চেনা মুখের আর কিছু চোখে পড়ল না। শুধু ছায়াবৃত একটা অস্পষ্টতা দৃষ্টিগোচর হয়ে রইল।

'আমায় তুমি ক্ষমা করো ভাই'—বললে নিকোলাস—'আমি মানুষটা এমনিই খুব ভাল নই। তার ওপর কষ্টে পড়লে আমার মন বেসুরো হয়ে থাকে—'

জুতো খুলে রেখে ব্রীজের ধারে আরাম করে বসল দুটি বন্ধুতে। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে খেলা করতে লাগল জলস্রোতের সঙ্গে। তাদের পায়ের নীচে উপলখণ্ডে নৃত্যপরা নদীর জল। দুই বন্ধুতে সেই নূপুর ধ্বনি শুনতে লাগল শ্রবণ ভরে।

বন্ধুর মাথায় হাত রাখলে নিকোলাস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে —'কী অল্প বয়স তোমার গিল্‌স—কত যৌবন তোমার শরীরে?'

গিল্‌স সে-কথায় কান দিলে না। আপন মনে বললে,—'মেরী—মেরীকে নিয়ে আমার এই ভাবনা তোমার কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকে, না? বলো না—স্বীকার করতে দোষ কি?'

নিকোলাস তার কথায় সাড়া দিলে না দেখে গিল্‌স আবার বললে —'সত্যি বলতে কি, জিনিসটা আমার নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য ঠেকে। তুমি যে মোহমুক্তির কথা বল, কি জানি হয়ত মেরীর ভালবাসার মধ্যেই আমি মুক্তি পাব।'

—'মোক্ষের ভাবনা ত তোমার একার নয়। সব মানুষেরই যতটুকু দরকার তোমারও ততটুকু প্রয়োজন মোক্ষের। তার জন্যে বিশেষ দুর্ভাবনা কি?'

অস্ফুট শিরশিরে গলায় গিল্‌স বললে—'থাক থাক। তুমি এমন নিরীহ অবুঝের মত কথা বলছ যেন আমার জীবনের কথা কিছুই জান না। যা বলেছি কিংবা যা কখনো বলিনি—কী তুমি জান না বল ত?'

—'নতুন করে জানবার কিছু নেই। তোমার বয়সী ছেলেরা যেমন তুমি তাদের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম নও।'

—'সত্যি বলছ নিকোলাস?'—বলে কিসের প্রত্যাশায় যেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল গিল্‌স। তারপর বললে—'তার মানে

অন্তত কিছু কালের জন্যে তাকে খেলাতেই হবে তোমায়, যত দিন না দুবের্নেরা ব্যাপারটাতে একটু অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।'

কার কথা বলছে বন্ধু তা যেন তার বুদ্ধির অগোচর, এমনি একটা ছলনার শেষ অভিনয় করলে নিকোলাস।

তার ভাবভঙ্গী দেখে অধীর কণ্ঠে গিল্‌স বললে—'অত আশ্চর্য হবার কি আছে বন্ধু? আগাথাকে চেনো না তুমি? তাকে অত সহজে বিশ্বাস করানো যাবে না—তা আমি ভাল ভাবেই জানি। হয়ত একটা এনগেজমেণ্টের পাকাপাকি করতেও চাইতে পারে। জিনিসটা খুব গোপনীয় রেখে সে ব্যবস্থায় তোমায় রাজী হবার ভাণ করতেই হবে বন্ধু।'

এ কথায় প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলে না নিকোলাস।

—'এমন ধারা কথা কি করে বলতে পারলে তুমি গিল্‌স? না, না, তা হতে পারে না। কোন কিছুর বিনিময়ে ও কাজ আমি করতে পারব না। তাকে যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছি আমি—বলতে গেলে আমার জন্যেই তার মন ভেঙে রয়েছে—তার ওপর—'

তার কথা শুনে গিল্‌স সরে গিয়ে বসল দেখে নিকোলাস বুঝতে পারলে যে তার মেজাজের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

তাই মিনতির স্বরে বললে—'কেন দুঃখ অভিমান করছ গিল্‌স? আমার অবস্থাটা তুমি বিবেচনা কর। তুমি হলে নিরঙ্কুশ ভাল মানুষ। স্বভাবটা আমারই তত ভাল নয়। আর সকলের দুঃখে আমার মন মমতায় ভরে উঠে—শুধু যে মেয়ে আমায় ভালবেসে দুঃখ পাচ্ছে তার জন্যে হয় না। সেই অভাগিনীর বুকে যে ভালবাসার আগুন জ্বলছে আমার জন্যে তাতে কোন ভাগ নেই আমার। তার জ্বালায় আমার মন ত গলেই না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। একে

তো সেই বিতৃষ্ণায় আমার শরীর মন জর-জর হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি বলছ কি না তার সঙ্গে আরো ছলনা অভিনয় করতে ?'

'কী পাগলের মত কথা কইছ ? ক'টা দিন ত তাকে আনন্দ-লোকের স্বপ্ন দেখাবে তুমি—চিরকালের জন্যে ত নয়। মুগ্ধ মেয়েমানুষ সে-স্বপ্নকেই সত্য বলে জানবে। সুখ আর সুখের কুহক দুয়ের মধ্যে আসলে তফাৎটা কি বল ত ?'

'এতটা ছলনা কি আমি পারব ?'

গিল্‌সের কথার প্রচ্ছন্ন নীচতায় গভীর মনস্তাপ পেলে নিকোলাস। মন যেন অশুচিতায় ভরে উঠল—কথা জোগাল না মুখে।

দাঁড়িয়ে উঠে অনেকখানি হেঁটে চলে গেল গিল্‌স আপন মনে। ফিরে এসে যখন আবার কথা কইলে, তার রূঢ় ভঙ্গিতে বিস্মিত হল নিকোলাস।

'সে ভাবনা নেই তোমার বন্ধু। ও-রকম কাজের যোগ্যতা যে তোমার কোন দিন হবে না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই আমার মনে। তুমি কেমন ধারা মানুষ শুনবে আমার মুখে ? দুনিয়ায় তোমার মত বিরক্তিকর অপাংক্তেয় লোক নেই। মরার পর কবে তুমি ভগবানের বিচার-সভায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নেই—সেই ভাবনায় এখন থেকে তুমি পাপ-পুণ্যের জমা-খরচ মিলিয়ে রাখছ। আর সেই অহঙ্কারে চলেছ সংসারের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। যদি মেরীর ভালবাসা আমায় সত্যিই হারাতেই হয়—ত জানব যে তোমার সাধুসঙ্গ করেই আমার সেই লাভ হল।'

দুটি হাত জড়ো করে আকাশে তুললে নিকোলাস। অবাক কণ্ঠে বললে—'কি বলছ গিল্‌স! আমি আবার সাধু হলাম কবে ?'

যেন জোর করেই হাসলে গিল্‌স।

—'বাবা, তুমি সাধু নও! তুমি সাধু নও ত সংসারে সাধু কে

শুনি ? জীবনকে তুমি ভালো হবার ফরমুলায় বেঁধে ফেলেছ। বলো সত্যি কি না ?'

—'আমারটা ত বেশ বুঝলাম। আর তুমি বুঝি যত দূর অধঃপাতে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করছ ?'

—'আমি ? আমি বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে যা করেছি তা তোমার কাছে অবধি স্বীকার করতে চাই না। বন্ধু আমি তাকেই বলি, যে নদীতে অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের লাশ ফেলে দিতে এগিয়ে আসে, অথচ একটি প্রশ্ন করে না মুখ ফুটে।'

—'অত দূর অবধি আমার কাছে আশা কোরো না তুমি গিল্‌স।' নিকোলাসের কণ্ঠে ক্ষুরস্য ধারা।

সে শাণিত প্রত্যুত্তর শুনে একটি অস্ফুট শব্দোচ্চারণ করে গিল্‌স শহরের দিকে পা বাড়াল। নিশীথ রাত্রির পটভূমিকায় তার ভারী বুটের শব্দ অনেক দূর অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুনতে লাগল নিকোলাস সেইখানে নিথর বসে বসে। সেই প্রতিধ্বনি এক সময় তার দুই কান ভরে বাজতে লাগল তার শরীর-মন জুড়ে। তখন বিশ্বচরাচরে আর অন্য ধ্বনি রইল না।

চকিতে উঠে উন্মত্তের মত ছুটতে লাগল নিকোলাস। যখন বন্ধুর নাগাল পেল, ততক্ষণে তার দম ফুরিয়ে এসেছে। গিল্‌স তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

—'শোন গিল্‌স'—বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল নিকোলাস—'দেখ। আমার মাথায় একটা সুন্দর মতলব এসেছে। মনে হয় এবার আমি সমস্ত ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে পারব। তবে কয়েকটা দিন আমায় ভাবতে সময় দিতে হবে তোমাকে—'

শুনে গিল্‌সের মন হাল্কা হল। তার প্রয়োজন বলেই যে

নিকোলাস এতখানি দুর্বলতার প্রশ্রয় দিচ্ছে তা বুঝতে বাকি রইল না গিল্‌সের। কিন্তু মনের ভাব অগোচর রাখলে সে।

—'সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেছে'—বলল গিল্‌স—'আর বেশী দিন এই ভাবে চলতে দেওয়া চলে না। তা হলে হয়ত দেখব পায়ের নীচে আর দাঁড়াবার মত জমি নেই। সে যে কি কঠিন হৃদয় মেয়েমানুষ, তা বোধ হয় তোমারও অজানা নেই বন্ধু।'

দুজনে নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করতে লাগল। আজ রাত্রে পরস্পরের গোপন ভাবনা প্রকাশ করলে না দুজনেই।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল গিল্‌স—'সত্যিই কি তুমি ঐ মেয়েটা—মানে আগাথার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা—'

—'ছি ছি! কি নোংরা কথা যে বল!'

—'আমি কিন্তু পারি'—মনের গভীর স্তর থেকে কথা উঠিয়ে আনতে লাগল গিল্‌স অন্যমনস্ক ভাবে—'আমি পারি ঐ মেয়ের সঙ্গে—কিন্তু সে কি হবে জানো?'

কদর্য হাসি হাসলে গিল্‌স। তারপর আরও অনেক অপরিচ্ছন্ন কথা বললে।

যে অনির্বচনীয় অপরূপা রাত্রিকে সঙ্গী করে বেরিয়েছিল নিকোলাস, রাত্রির সে রূপ আর রইল না চোখে। সে পবিত্র শুচিতা হরণ করেছে দস্যু গিল্‌স, ভাবলে নিকোলাস। চেয়ে দেখলে গীর্জার দিকে। মনে হল ঐ গীর্জা যেন বিশ্বজোড়া অন্ধকারে নোয়ার জাহাজ। ভাঁটা-লাগা বন্যাস্রোতে চড়ায় আটক পড়েছে। নোংরা পরিবেশের মধ্যে ইঁদুরদের লুণ্ঠন দস্যুতার কে যেন ইন্ধন হিসাবে যুগিয়ে দিয়েছে এখানে।

নিকোলাসের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল দুজনে। আজ আর

গিল্সকে সহ্য করতে পারছিল না সে। তাই তাড়াতাড়ি বন্ধুকে বললে নিকোলাস—'না না, এখন আর ওপরে এসো না।'

॥ ৯ ॥

আজ আর সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে আলো জ্বাললো না নিকোলাস।

মা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন ভাবছিল সে—এমন সময় খনখনে মিহি গলায় তার নাম ধরে তাকে ডাকতে শুনতে পেল নিকোলাস। যতক্ষণ ছেলে বাড়ি না থাকে এক তলার ছোট ঘরখানিতে ঘুমোন তিনি। দরজায় সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে নিকোলাস মায়ের বিছানার ধারে একেবারে তাঁর বালিসের শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁধান দাঁত খুলে রেখেছেন মা। গাল দুটি বসে গেছে। চশমা নেই চোখে। মায়ের চাউনি বড়ো রূঢ়, অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। যেন মানুষের দৃষ্টি নয়—পাখির চোখ, নয় ত মাছের চোখ মনে হচ্ছে।

—'বড়ো দেরী করিস বাবা। আমি দরজায় চাবি দিতে পাচ্ছিলাম না। কোনদিন তোর জন্যে আমি দেখছি খুন হব।'

গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে নিকোলাস।

—'কেন, আমায় একটা আলাদা চাবি দিলেই ত পারো মা?'

—'তা আবার নয়? চাবি তোমার হাতে না দিলে হারাবার সুবিধে হবে কেন?'

বারো বছর আগে একবার নিকোলাস একটা চাবি সত্যিই হারিয়েছিল। সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না মা। এই বার নিয়ে অন্তত হাজার বার বলা হল সে-কথা। তালাটা পাল্টে দিতে হয়েছিল, কিন্তু মা চাবিওয়ালার বিলটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।

মায়ের ওপর অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে নিকোলাস—'কি করতে বল আমায়? তবে কি জানলা টপকে বাড়ির ভেতর ঢুকব না কি?'

—'করবে আবার কি? সন্ধ্যেটুকু মায়ের কাছে থাকবে, যে মা তোমার সেবা করে করে শরীর পাত করে ফেললে। তোমার মুখ চেয়ে যে মা আর বিয়ের কথা ভাবেনি—বিয়ের সুযোগ যে আসেনি তা কখনো ভাবিসনি মনে মনে। তোমার ইস্কুলের মাইনে যোগাতে যে মা ঠিকে কাজ করেছে—বড় লোকের ঘরে কাপড়-চোপড় কেচে দিন কাটিয়েছে। অমন যে গীর্জার পুরোহিত আমায় কাজ দিয়েছিল সে-ও সংলোকের দাক্ষিণ্যের পয়সা ভালো হাতে পড়বে এই ভরসায়।'

নিস্প্রভ কণ্ঠে জবাব দিলে নিকোলাস—'আমি কি কখনো আমার কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করেছি তোমার কাছে?'

—'তুমি আমার ভালো ছেলে—সে আমি হাজার গলায় বলব। কিন্তু আজকাল ঐ সব বদ ছেলের সংসর্গে পড়ে তুমিও যেন আমার বদখেয়ালী করে বেড়াচ্ছ, এই আমার নিত্য ভয় হয়—'

—'ও কথা কেন বলছ মা? তুমিই ত বলো ও বড়ো ভালো ছেলে—'

—'সে কথা বলি বাছা যাতে তোমার মনে দুঃখ না লাগে। আমি মা, নিজের পেটের ছেলের মন জলের মত দেখতে পাই আমি—'

মায়ের গলায় অস্পষ্ট ঈর্ষার ইঙ্গিত পেল নিকোলাস। মনে পড়ল একদিন কবিতা লিখেছিল সে।

—'যে অভাগিনীর কপালে কুঞ্চন—জীবনের সর্বস্বের চেয়ে যিনি আমায় ভালবাসেন তিনি আমার মা।' কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সে কাব্যময়ীর সঙ্গে এই শয়নলীনা প্রত্যক্ষময়ীর কত দুস্তর ব্যবধান।

এ শহরের কে না বলে যে সালোদের ঘরের ঐ ছেলেটা কিছুমাত্র সুবিধের নয়। ওর সঙ্গে তোমার কিসের এত ভাব—তা বাপু আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না।'

সেই নিষ্ঠুরভাষিণীর মুখের কাছে নত হয়ে নিবিড় স্নিগ্ধতায় নিকোলাস চুম্বন করলে জননীর মুখ। বললে—'এইবার তুমি ঘুমোও মা।'

কিন্তু মায়ের গজর গজর থামল না। তিনি তেমনি অভিমানী স্বরে বললেন—'অন্তত কথার একটা জবাব ত দিয়ে যাবে? একটা কথা বললাম, তার জবাব দেবার দরকার বোধ কর না এমনই কি অপদার্থ বুদ্ধিভ্রংশ ভাব বাছা মাকে।'

মনের সব বিরূপতা সরিয়ে ফেলে খুব সহজ একটা স্মিত হাসি হাসলে নিকোলাস। তারপর দরজার কাছে পৌছে আদরের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মাকে চুমু দিলে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠতে লাগল নিকোলাস—দু'টি পা যেন কিসের ভারে মন্থর হয়ে পড়েছে। যেন পিঠের উপর কত দুর্ভর ভার—যেন একটা বিরাট ভারী লোহা তার কাঁধকে ফাটিয়ে দু' ভাগ করে ফেলেছে।

তেলের বাতি জ্বালিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল নিকোলাস নিজের নির্জন ঘরের মধ্যে। আজ সন্ধ্যে থেকেই অন্যমনস্কতায় কখন তার মনের কুয়াশা সরে গেছে। যে কুহকাচ্ছন্ন দৃষ্টির দীপালোকে জগৎকে সে দেখে বেড়ায় কখন অলক্ষ্যে সেই কুহকের আবরণ খুলে পড়ে গেছে।

মাকে আজ বড় প্রত্যক্ষ প্রকট দেখতে পেয়েছে সে। নিজের ঘরখানিও আজ আর মায়াময় বোধ হচ্ছে না—যেন কোথায় কি সব বদলে গেছে। ঘরের ছাতে বাড়ির ভূষোলাগা স্যাঁতাধরা দাগটা

প্রতিদিন বড় হচ্ছে। চাপড়ে মারা মাছির দাগে দাগে দেওয়ালের কাগজগুলো শতকলঙ্কী। তার মেহগনী খাটের পাশে রাখা নোংরা পাত্রটা থেকে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পেলে নিকোলাস। যে দামী ভারতীয় শালটা তার টেবিলের উপর এত কাল শোভা বর্ধন করে আসছে, যার অপরূপ কারুকার্যতায় কত কবিতাকে রোমাঞ্চময় বর্ণনায় শিহরিত করেছে সে,—সেটার দিকে তাকিয়ে মনে তার অরুচি ধরল। উইপোকায় শতছিদ্র করেছে শালটা। মোমের বাতির দাগে দাগে তার আর রূপ-জৌলুষ কিছুমাত্র অবশেষ নেই। আরাম কেদারার পিছনের দিকে যেখানে গিল্‌স হেলান দিয়ে বসে, সেখানে মাথার তেলের কদর্য একটা দাগ ধরেছে দেখে তার শরীর অসুস্থতায় রী-রী করে উঠল।

গিল্‌স! মনে মনে উচ্চারণ করলে নিকোলাস। গিল্‌স! তার রূপবান শরীরে ঢল-ঢল যৌবনের জোয়ার নেমে আসছে ইতিমধ্যে। এখনি যেন বুঝতে পারে নিকোলাস আর দশ বছর পরে ভাঁটার অল্প জলে গিল্‌সের চিত্ত-জলাশয়ের কি চেহারা তার চোখে পড়বে! সেই আগামী প্রতিচ্ছবির দুটি একটি খুঁটিনাটি ইতিমধ্যেই বিম্বিত হয়েছে না ওর মুখে?

ফুঁ দিয়ে দীপটা নিবিয়ে দিলে নিকোলাস। বাইরের হাওয়ার দোলায় দোলায় গরম তেলের গন্ধটা ধীরে ধীরে মৃদুতর হয়ে এল ঘরের মধ্যে। সেই চেনা আধ-আঁধিয়ারে অভ্যস্ত হয়ে এল দু'টি চোখ। চাঁদ কখন নেমে গেছে দিকচক্রবালের দিকে। তার পিছনে একটা দুগ্ধশুভ্র ছায়াপথের ভূমিকা দেখা যাচ্ছে নীলাকাশে। আর দেখা যায়, সেই দিগন্ত-জোড়া নীল জলধির অসীম শূন্যতায় তটরেখার অস্পষ্ট আভাসের মত—দুটি-একটি মেঘের অস্ফুট চলরেখা। কেবল একটি নিঃসঙ্গ তারা ঐ আকাশ-প্রাঙ্গণে জোনাকির মত ঝিকমিক করছে।

সেই নৈসর্গিক প্রকৃতির দিকে উন্মনা হয়ে তাকিয়ে রইল নিকোলাস। গিল্‌সের নাগাল ধরার জন্যে ডোর্থের পথে যখন ছুটে যাচ্ছিল সে, যে আচম্বিত চিন্তা তার মনকে ক্ষণপ্রভার মত আলোকিত করে দিয়েছিল—সেই পরম লগ্নটিকে আরো কিছু কালের জন্য বিলম্বিত করতে চাইলে নিকোলাস। গিল্‌সের জন্যে আরো কিছুদিন তাকে থেকে যেতেই হবে।

'মাথায় আমার একটা আইডিয়া এসেছে কিন্তু তার জন্যে আমায় আর কিছু দিনের সময় দিতে হবে ভাই।'

আইডিয়া! সত্যি আইডিয়াই বটে। সেই মনোলীন আইডিয়ার ভয়াল রূপ-কল্পনায় বিমোহিত হয়ে রইল নিকোলাস। গিল্‌সের অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করবে না কিন্তু তাই বলে কোন মিথ্যা প্রবঞ্চনা কি অন্যায়ের আশ্রয় নেবে না নিকোলাস। আগাথাকে যে অভিজ্ঞান অর্পণ করবে সে তার মধ্যে কোন ফাঁকি রাখবে না নিকোলাস।

সে মহাশূন্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করে ভয়ার্ত গভীরতার পরিমাপ করতে চায় না এখন। কত মাস যাবে। হয়ত বা কত বৎসর। সে দুরবগাহ শূন্যতা আর তার মধ্যে তার মা আরও কতদিন আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মা বড়ো ঘৃণা করেন আগাথাকে। মায়ের আপত্তি তাকে খণ্ডন করতেই হবে একদিন। আর তার দারিদ্র্য! নিজের ক্ষুধা মেটাবার যোগ্যতা নেই তার—কেমন করে জায়া-পুত্র-পরিবার প্রতিপালনের অত দায়িত্ব নেবে সে?

আগাথার সঙ্গে যে এন্‌গেজমেণ্ট করবে নিকোলাস, তার মধ্যে কোন কপটতা বঞ্চনা থাকবে না। বাগ দত্তার সঙ্গে থাকবে তার চারশ' মাইলের ব্যবধান। হৃদয়ের পরিচয় ঘটবে পত্রদূতীর মারফৎ। ভারি মিষ্টি হাতে চিঠি লেখে আগাথা। সে-ও লিখবে চিঠি, যত খুশি

চাইবে তার বাগ্‌দত্তা। এইটুকু অবধি ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু তার পর যত দেরীই হোক—একদিন সেই অনিবার্য ঘটনা ঘটবেই ত তার জীবনে। মুখোমুখী দাঁড়াবে সে বিপর্যয়ের।

সে অবশ্যম্ভাবী দিনটির কথা ভাবতে লাগল নিকোলাস। কত রকম করে নিজের ভাবনাকে ভাঙাচোরা করতে লাগল। দু'জনের কি দুটি পৃথক্ শয্যা থাকবে? থাকবে দু'জনে পৃথক্ ঘরে? কিছুতেই ব্যবধান হবে না, ভাবলে নিকোলাস—যদি না তাদের দু'জনের মাঝখানে থাকে এমন কোন নিশ্ছিদ্র বাধার প্রাচীর—যার দুই পাশে দুটি প্রাণীর নিঃসঙ্গতা হবে নিরঙ্কুশ। সে পরিবেশের সঙ্গে নিজের মনকে মানিয়ে নিতেও তার বেশ কিছু সময় লাগবে।

একদিন তাদের সন্তান হবে। সে সম্ভাবনায় অনেকখানি আকাশ-পথ মুক্তপক্ষ কল্পনায় অতিক্রম করে চলে গেল। নিকোলাসের মন আত্মজ শিশুর হাসিতে-কাকলীতে ভরে উঠবে জীবনের শূন্য আকাশ। আগাথার কোলে তার শিশু—তা হোক—ভাবলে নিকোলাস। দেখতে শুনতে এমন কিছু মন্দ নয় মাদাম আগাথা। জীবনে খুশীর জোয়ার এলে অমন মুখ-গোমড়া পাষাণী মেয়েও মোহিনী হয়ে উঠবে। যেদিন মেরীর সঙ্গে গিল্‌সকে নির্জনে দেখা করবার সুযোগ দেবার জন্যে নিকোলাস তাকে নিয়ে গিয়েছিল বনান্তরালে, সেদিন কী বিকশিত রমণীয়তাই না দেখেছিল আগাথার মুখে। চেনা মেয়েকে যেন চিনতেই পারেনি নিকোলাস, এত উঁচু স্বরে বাঁধা ছিল তার মনোবীণা। সহজ ভাবে কইতে পারেনি সহজ কথা। কথা কইবার আগেই অনুরাগিণীর হৃদয় অস্থির, পুলকিত তনু জর জর, কম্পিত পল্লব দুটি নয়নের। রমণীর কণ্ঠে দুস্তর লজ্জা।

ঐ মেয়ের যে ছবিটি মনের পটে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে চায় না নিকোলাস, সে তার প্রথম দর্শনের স্মৃতি। বার বার আজ

আগাথাকে সেই ভাবে-ভঙ্গীতে দেখতে পেলে সে। সেদিন আগাথা বলেছিল—'কী হল গো তোমার? অমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছ কেন?'

তারপর দিনে দিনে অবশ্য সবই সহজ সরল হয়ে গেছে। অন্তত এবার গিল্‌স বাঁচবে। সুখী হবে। মন আবার সন্দেহে দুলতে লাগল তার। সুখী হবে না গিল্‌স—তবে শান্তি পাবে—পাবে আরাম। রবিবারে গীর্জায় যেমন অনেক আয়েসী লোক দেখে নিকোলাস, বন্ধু গিল্‌সও তাদের মত হয়ে উঠবে। ঘাড়ের উপর চর্বির ঢেউ খেলান নিয়ে আরাম করে বসবে। এখন থেকেই ত সে চোস্ত কলার গলায় আঁটে।

গিল্‌সের কথা ভাবতেই মন ফিরে গেল যৌবনের সেই মধুর দিনগুলিতে। সারা দিনমান প্যারিসের পথে পথে কত গল্প করে বেড়াত তারা দু'জনে। রাত হয়ে এলে ক্লান্ত শরীর জুড়াতে দু'জনে আরাম করে বসত মেডলীনের মুখোমুখী বেঞ্চিতে। তার পর কবিতা আবৃত্তি করত নিকোলাস মন্দ-মধুর কণ্ঠে।

মনে পড়ল, অমনি একদিন গিল্‌স তাকে বলেছিস—'এ রাত ভোর হবার আগে যদি দু'জনে একসঙ্গে মরি—কি ভালোই লাগবে বল ত?'

॥ ১০ ॥

'মেরীর সঙ্গে আমারও যাওয়া উচিত ছিল'—বললেন মাদাম, 'মঁজিদের বাড়িতে যে ও একলা রয়েছে, এটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

স্ত্রীর এ-কথায় প্রতিবাদ করলেন স্বামী—'তোমার যাওয়ার কথাই ওঠে না। জান ত ডাক্তার তোমায় বিশ্রাম নিতে বলেছেন—'

কনুয়ে ভর দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মেরীর বাবা। চারটে বাজেনি এখনো, এর মধ্যেই জানলা আধ-ভেজান করে খোলা হয়ে গেছে। সেই ঝড়-জলের পর থেকে আজ-কাল দিনের বেলাতে বাইরের আগুনের হলকা ক্রমশ কমছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন আরাম করে। কিন্তু স্বামীর সিগারেট ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর অভিযোগের পাঁচালি সুরু হয়ে গেল।

—'ওগো, দয়া করে এখানে নয়'—

অত আরামের ধরানো সিগারেটটা বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন স্বামী। শূন্য পেয়ালাটা এগিয়ে দিতেই গিন্নীর হাত থেকে সেটি নিয়ে নিল আগাথা। বললে—'আমি এক্ষুণি ও বাড়ি গিয়ে খোঁজ করছি। মেরীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি বাড়িতে।'

—'সালোঁদের বাড়ির সেই ছেলেটাও নিশ্চয় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছে ওদের বাড়ি। এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। মঁজিদের ত কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। যাকে তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেই হল?'

—'মেরী আমাকে কথা দিয়েছে'—বললে আগাথা—'কথা দিয়ে

গিয়েছে যে, ও গিল্‌সকে এড়িয়ে চলবে। একটি কথাও পারত পক্ষে কইবে না তার সঙ্গে।'

—'কথা কইবে না ত খুব বুঝলাম। কিন্তু চোখ ত আর বুজে থাকবে না গো। চোখাচোখি হতে বাধা নেই। চোখের ইসারায় হাজার রকম কথা বলা যায়। মেরীর জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। যখন ভাবি সে আমারই পেটের মেয়ে—'

—'কিন্তু আমি বলি কি জান?'

মেরীর বাবা পাড়লেন বটে কথাটা, কিন্তু শেষ না করে মাঝ-পথে থেমে গেলেন। উঠে গিয়ে আবার জানলার কাছে দাঁড়ালেন। অল্পক্ষণ চুপচাপ সময় কাটল ঘরের ভিতর। তার পর আবার মেরীর মা ধনুঃশর নিয়ে সুরু করলেন অনুযোগ বর্ষণ।

—'ঐ যে ডাক্তার সালো। কেন যে ঐ হাতুড়ে গেঁয়ো ডাক্তারকেই সময়ে-অসময়ে ডাকি জানি না। যত বার ওর কাছে দেখাতে গেছি, মস্ত মস্ত কেতাব খুলে ডাক্তার অমনি পড়তে বসল। ডাক্তারীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। লোকটা একেবারে আকাট মুখ্যু।'

—'কিন্তু হাঁটতে গেলেই ঐ যে তোমার পা দুটো জগদ্দল বোঝা ঠেকে, তার ব্যবস্থা? অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে'—বললেন স্বামী—'এ সব ব্যাপারে ডাঃ সালোঁর মত বিচক্ষণতা ঐ অল্পবয়সী ছোকরার কাছে আশা করাই অন্যায়।'

কুশন থেকে মুখ তুললেন মেরীর মা। অসুস্থ মুখটা বিসদৃশ লম্বা করে টেনে টেনে বললেন—'তাই বলে ঐ ফন্দিবাজ লোকটার দরজায় ধর্ণা দিয়ে বসে থাকব—এই কথাই বলতে চাও না কি?'

—'এ বিয়েতে'—বললেন মেরীর বাবা—'এ বিয়েতে তোমার চেয়ে তার আগ্রহ বেশী নয়।'

—'কী বাজে বকছ তুমি? এই সব গল্প-কথা কোত্থেকে শুনলে বল ত?'

'কেন, আগাথার কাছ থেকে'—বলতে গিয়ে আত্মসংবরণ করলেন স্বামী। আগাথা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে আছে দেখে চুপ করে গেলেন তিনি। শুধু বললেন—'সারা শহরে সবার মুখেই ত ঐ কথা শোনা যাচ্ছে। খবর পেলাম বাড়ি বাগান কেনার পর আমাদের ভালমানুষ ডাক্তারটি ভবিষ্যতের প্ল্যান নিয়ে বসে আছেন। অনেক নামও শোনা যাচ্ছে। লোকে বলাবলি করছে যদি জানতে পারি আমরাও নাকি হকচকিয়ে যাব। বোর্দোর বড় বড় ব্যবসাদাররা এর মধ্যেই এখানকার ভূসম্পত্তির দিকে চোখ দিতে সুরু করেছে।'

—'তাতে তাদের যদি লাভ হয় তারা যা খুশি করুক্।'

মেরীর মা যেন ভয়ঙ্কর মুষড়ে পড়লেন স্বামীর কথা শুনে। কিন্তু মুখে সে-ভাব গোপন করে বললেন—'যে সব জমি-জায়গা আমরা ঘেন্নায় ছোঁব না, ঐ সব পয়সাওলা হাঘরেগুলো তাই নিয়ে দেখবে মস্ত নাচানাচি করবে। যা পাবে তাই কামড়ে পড়ে থাকবে ওরা। তা থাক। করুক না ওরা খোঁজ-খবর—তারপর দেখা যাবে'খন। কিন্তু এখানকার মেয়ে-পুরুষ আমার মেয়ের কাণ্ড নিয়ে যা সব বলাবলি করছে, শুনে যে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে গো।' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কথাটা শেষ করলেন মেরীর মা।

স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া কথাবার্তায় আগাথাও তার বক্তব্য পেশ করলে। বললে—'ও রকম মানুষদের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কি আশা করতে পারেন? টাকাই জপ-তপ ধ্যান নয়, এমন লোকও যে সংসারে আছে তা ওদের মগজে ঢোকে না। আপনারা আর ওরা শুধু ত দু'ঘর নন। জাতই আলাদা। ওদের জীবনের

দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। বর-কনে দু'জনের মধ্যে আমাদের মেরীই যে বেশী সম্পত্তির মালিক হবে একথাটা ওদের বোঝাতে আমার মুখে ফেনা উঠে যায়। 'আহা, যাদের অভাব লেগেই আছে সংসারে'—এমন ইডিয়েটের মত কথা বলে যে শুনলে গা জ্বলে যায়। হবে নাই বা কেন, ওদের ভাবনা-চিন্তা সব ঐ এক চরকিতেই পাক খাচ্ছে ত।'

—'কথাটার মধ্যে কিছু সত্যি আছে বই কি'—চাপা গলায় বললেন মেরীর বাবা। তারপর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন—'সে কথা যাক, আমি যত দূর শুনলাম যে আহাম্মুকরা বাগান বাড়ি বিক্রী করেছে তারা লাইব্রেরীটাকেও নাকি বেচে দিয়েছে। লাইব্রেরীতে সত্যিকার দামী বই পত্তর অনেক ছিল শুনেছি।'

—'আমি নিজে জানি'—বললে আগাথা—'কলেজে সবাই বলাবলি করত, লাইব্রেরীতে নাকি প্রভিন্সিয়ালের প্রথম সংস্করণের একখানা কপি ছিল—তাতে প্রফেসর আরনল্ডের নিজের হাতে নোট লেখা ছিল মার্জিনে।'

—'তা কি করে সম্ভব? তখন ত......' স্বামীর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিলেন মেরীর মা।

—'পাঁচটা অবধি অপেক্ষা না করে এখনই মঁজিদের ওখানে তোমার যাওয়া ভাল আগাথা। তুমি বরং তাই যাও।'

—'আমিও উঠি। তোমাকে ক্লাব পর্যন্ত এগিয়ে দেব'খন'—বললেন মেরীর বাবা।

—'তোমার যাবার দরকার নেই। তুমি দয়া করে আমার কাছে থাক। একলা এই ঘরে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না আমার। ঘণ্টা বাজালেও নীচ থেকে চাকর-বাকরদের সাড়া পাওয়া যায় না। তা ছাড়া তুমি ত সেখানে গিয়ে মদ গিলবে—'

তারপর যেন খুব ঔদার্য দেখাচ্ছেন, এমনি একটা ভাব নিয়ে

বললেন—'যদি চাও এখানে বসেই যত খুশি সিগারেট খেতে পার। দরজা হাট করে খোলা থাকলে খুব অসুবিধা হবে না আমার।'

নিরুপায় হয়ে পা রাখবার টুলে ধপাস করে বসে পড়লেন স্বামী। তারপর অলস হাতে পকেট থেকে করপোরালের প্যাকেট বার করলেন।

প্রথম দৃষ্টিপাতেই আগাথা বুঝতে পারল মেরী তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে। নিমন্ত্রিতদের যে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে টেনিস খেলা দেখছিল গিল্‌স, তার থেকে বেশ ব্যবধান রেখেই এক টেরে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। উপস্থিত সব ক'টি মেয়ের মধ্যে তাকেই সবার আগে চোখে পড়ে, এমনি বৈশিষ্ট্যময়ী তার রূপ। মাজা-ঘসা সুপরিপাটি চেহারাটি তার। সর্বাঙ্গে একটা মদালসা ভাব। আজকের নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে মেদ-সর্বস্ব মাথায় ছোট মেয়েদের ফিতে কাঁটা আর প্রসাধন সম্ভারের জৌলুষের মধ্যে নিরলঙ্কৃতা মেরীকেই দেখাচ্ছে ছিমছাম দীর্ঘাঙ্গী। ক্ষীণ-কটি মেরীর নিতম্ব দুটি এখনো পরিপূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এক মুঠি দুটি নরম উদ্ধত বুকের দিকে তাকালে দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়—মেয়েটির শরীরের আর সব অবয়ব ভুল হয়ে যায়।

বাগানের আর এক প্রান্তে খাবার-দাবারের আয়োজনের কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে গিল্‌স। হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে অখুশীর ভাব। চুলে জবজবে করে ব্রিলিয়ান্টাইন ঢেলে এসেছে গিল্‌স, তবু মাথার চুল তার মোরগের ঝুঁটির মত খাড়া হয়েই আছে। চোস্ত কলার গলায় ফাঁস লেগে সারা মুখে যেন আগুন ঢেলে দিয়েছে। ছেলেদের মধ্যে গিল্‌সকেও একটু অন্য রকম লাগছে। তার বয়সী ছেলেরা ত এর মধ্যেই শরীরে মেদের সঞ্চয় সুরু করেছে। ঘাড়ে-গর্দানে পায়ে-হাতে এরা সবাই

যেন এক রকম দেখতে। মনে পড়ল আগাথার—এই জন্যেই নিকোলাস একদিন বলেছিল, গিল্‌সের শরীরে একটা পবিত্র আভা আছে অনেকটা দেবদূতের মত। সে-কথার সার্থকতা আজ যেন উপলব্ধি করল আগাথা।

সালোঁদের ছেলেটাকে দেখে এখন আর রাগে গা জ্বালা করে না তার। ঈর্ষাও হয় না। মাদাম মঁজিকে ঘিরে মহিলাদের যে ছোট একটি জটলা সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের কয়েক জনের সঙ্গে অল্প কথায় আলাপ করলে আগাথা। কিন্তু কেউই তাকে বসতে অনুরোধ করলে না। কোন এক ঘরের আদরিণী মেয়ে বটে সে, কিন্তু এখানে ত সে গভর্ণেস হিসেবে এসেছে। তাকে সামাজিক সমাদর না করলেও যেন চলে।

যেতে যেতে আগাথার কানে এল, কে যেন তার সম্বন্ধে মন্তব্য করে বললে—'মেয়েটার ভেতরে ভেতরে কি হচ্ছে কে জানে? ওর রকম-সকম আজ-কাল সব বদলে গেছে। কেমন যেন পুরুষ-ঢলানি ভাব।'

—'ও সবের নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা। ও মেয়ে ডুবে ডুবে—'

—'ওরে বাবা, হাওয়ার মুখে খবর ছোটে—ও সব কি আর চাপা থাকে? কাণাঘুষো আমিও শুনেছি।'

তার পিছনে একটা হাসির রোল উঠল মেয়েদের ভিড়ে। ইতস্তত ছড়ানো নানা দলের মধ্য দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে গেল আগাথা। একটু পাক খেয়ে শেষে খাবারের আয়োজনের পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই গিল্‌স এগিয়ে এল। সাগ্রহে বলল—'কেমন আছেন?'

কোন রকমে সাড়া দিল আগাথা। দু'-একটি টুকিটাকি কথা সেরে নিয়েই ফেরার পথ ধরল সে। তবে একেবারে মুখ ফেরাবার

আগে গিল্‌সকে শুনিয়ে দিয়ে এল—'আজ রাত নটার সময় বীথির ধারে থাকব। নিকোলাসকে বলবেন। মেরীও আপনার জন্যে চাতালে অপেক্ষা করবে।'

গিল স তার কথা বুঝতে পারলে কিনা মনে মনে আশঙ্কা করলে আগাথা। অথচ আর বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হল না, পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে।

মেরীর কাছে গিয়ে বললে আগাথা—'এবার বাড়ি চল।'

আরও দু'-চার মিনিট থাকার জন্যে মেয়েটা মিনতি করতে লাগল। আগাথা তাকে অস্ফুট গলায় আশ্বাস দিয়ে বললে—'ভয় কি মেরী, আজ সন্ধ্যাবেলাতেই দেখা হবে'খন তার সঙ্গে।'

'সত্যি'—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে মেরী।

চিত্তচাঞ্চল্যে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে নব-অনুরাগিণীর। গভর্নেসের বাহুলগ্না হয়ে সে যেন আরাম করতে লাগল। সোহাগের গদগদ স্বরে গুন্ গুন্ করে বললে আগাথা—'দুষ্টু মেয়ে। আমার বোকা মেয়ে।'

—'কি ভালো মেয়ে তুমি গো—তোমায় খুব ভালবাসি আমি'—বললে মেরী।

—'ওর দিকে আর তাকিও না, চল আমরা নিরিবিলি সরে যাই।'

তাদের অপস্রিয়মান মূর্তি দুটির দিকে চেয়ে মঁজি গিন্নি বললেন—'চলল মেয়েটাকে টেনে নিয়ে। যাক গে।'

॥ ১১ ॥

ক্ষীয়মান শশিকলাও এত আলোর স্থধা ঢালতে পারে, আশ্চর্য! কেউ যাতে না দেখতে পায় এমনি ভাবে আত্মগোপন করে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগল আগাথা। এক পাশে পাথরের স্তূপ, আর এক পাশে নালা—তার মাঝ দিয়ে পা টিপে টিপে সাবধানে এগোতে লাগল সে। অভিসারিণীর মনে উৎকণ্ঠার অবধি নেই। নিকোলাস নিশ্চয়ই নগরের উপান্তে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। কিংবা হয়ত গিল্‌স ধরতেই পারেনি তার ইংগিতের মর্মার্থ। হয়ত খবরটা বিকৃত করে পৌছেচে তার কানে। রাস্তাটা যেখানে লেরোকে ছুঁয়ে গেছে সেই পর্যন্ত যাবে সে। জলার ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে। আশে-পাশে কোথাও স্থর তুলেছে ব্যাঙেরা। ঠিক তার মাথার উপরই একটা পেঁচা ডেকে উঠল কর্কশ কণ্ঠে। হঠাৎ নিকোলাসের মূর্তি নজরে এল আগাথার। ছায়ার আঁধারে উঁচু আলসের উপর বসে আছে সে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল নিকোলাস। আগাথা সোজা তার কাছে এগিয়ে যেতেই বললে—'বস। এখানে রাস্তা থেকে তোমায় চোখে পড়বে না।'

কত আশা করে অপেক্ষা করতে লাগল আগাথা, কিন্তু নিকোলাস আদর করে কাছে নিল না তাকে। মুগ্ধা নারীকে এমন নির্জনে পেয়েও তার অধর-স্থধায় লোভ করলে না পুরুষ।

—'ওরা ছুটিতে এক হয়েছে? কোন বিপদের ঝক্কি নেই ত?'

—'কিসের বিপদ?'—রসহীন গলায় প্রতিপ্রশ্ন করল আগাথা। 'মেরীর মা অস্থস্থ। আর ধরাই পড়ে যদি, সমস্যার সমাধান

সহজ হয়ে যাবে। তখন বাপ-মা হয়ত ওদের চার'হাত এক করে দিতে বাধ্য হবেন।'

তবু নিকোলাস কিছু বললে না। ও বুঝি ঐ পাথরের মতই হৃদয়হীন? ঐ যে বিরাট মহৎ দেওদার মৃত্তিকার অন্তর্লোক দিয়ে সহস্র শিকড় স্রোতস্বতীর জল অবধি পাঠিয়ে দিয়ে আকাশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিকোলাস কি ঐ বনস্পতির মতই? ভাবলে আগাথা। তারপর বললে—'অবশ্য সে রকম কিছু ঘটলে সেখানে আমায় চাকরিটি খোয়াতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেতে হলে আগে হোক পরে হোক, এ চাকরি আমায় একদিন ছাড়তেই ত হবে।'

আচম্বিতে নাড়া খেয়ে জেগে উঠল যেন নিকোলাস।

—'না, আগাথা না। অমন কথা মনেও স্থান দিও না। চাকরি হারানো চলবে না কোন মতেই। কিছুই ত পাকাপাকি হয়নি। এ সম্বন্ধে মাকে এখনো একটি কথাও বলা হয়নি আমার।'

—'কেন বলনি?' আর কিসের অপেক্ষায় দেরী করছ বল ত?' প্রশ্ন করল আগাথা। প্রাথমিক ব্যবস্থা করেছে, এই ধরণের কি যেন বললে নিকোলাস তোতলাতে তোতলাতে। চারিদিকের আটঘাট বেঁধে খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে ত।

—'মায়ের সম্মতি আদায়ের ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। তাঁকে রাজী করানোর উপায় জানি আমি। তাঁর মন পেতে বেশী সময় লাগবে না আমার।'

নিজের উপর কী অবিচল আস্থা আগাথার! কেমন তীরের মত সোজা এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্যের দিকে। কেমন একটা উৎকন্ঠিত আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠল নিকোলাস। ওর ভরসা ছিল মায়ের মত পেতেই দীর্ঘ দিন লাগবে। হয়ত মায়ের মৃত্যু-দিন অবধি

অপেক্ষা করতে হবে তাদের। এই রকম একটা আশা ছিল তার মনের অগোচরে। এ প্রস্তাবে মা যে না বলবেনই, সে-সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিত ছিল সে। আর এই একগুঁয়ে মেয়েটা অপার আত্মবিশ্বাসে তার সমস্ত ভাবনা-বাসনাকে তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

—'আমার মাকে তুমি চেন না।'

—'কিন্তু আমাকে ত জান তুমি?'—বললে আগাথা—'আমি যখন কোন বিষয়ে মন স্থির করে ফেলি—'

একটা কপট ঔদাসীন্যের ভাব মুখে এনে প্রশ্ন করলে নিকোলাস —'মাকে কি বলবে তুমি?'

—'সেটা আমার ব্যাপার—গোপনীয়। দেখবে তুমি আজ থেকে এ সপ্তাহের মধ্যে মা তোমাকে বিয়ের দিন ঠিক করতে তাগাদা দেবেন। বলেন কি না দেখে নিও।'

শুনে নিকোলাস শিউরে উঠল। হয়ত আগাথা মস্ত দম্ভ দেখাচ্ছে তাকে। কে জানে, হয়ত এই ভাবে তাকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করছে মেয়েটা।

সেই নিবিড় নির্জনতায় ক'টি মুহূর্ত নীরবতায় নিথর হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত নিকোলাস বললে—'বিয়ের দিন ঠিক করার কথাই ওঠে না। তা কি করে সম্ভব? আমাদের সংসার পাতার মত যথেষ্ট টাকা যত দিন না জমাতে পারছি তত দিন ত অপেক্ষা করতেই হবে।'

যাক্ তবু 'আমাদের' কথাটা উচ্চারণ করেছে পুরুষ। এই কথাটুকুর জন্যে নিজেকে কম ভাগ্যবতী ভাবলে না আগাথা। বললে—'কিন্তু আমি ত কাজ করব। আমার জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না তোমাকে। কারুরই করতে হয়নি কোন-দিন।

আমি প্যারিসে চাকরীর চেষ্টা করছি—দু'-একটা সুযোগও পেয়েছি। তাছাড়া'—নিবিড় অনুরাগের সঙ্গে বললে আগাথা—'একটি ঘর হলেই চলে যাবে আমাদের। দিনে একবেলা কোন সস্তা হোটেলে খাওয়া হলেই যথেষ্ট। ও আমার অভ্যাস আছে। স্পিরিট-ল্যাম্পে রাঙাআলু রান্না করতেও জানি আমি। একবার সারা শীতকাল সিদ্ধ রাঙাআলু খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম আমি।'

এই পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে বিশাল বনস্থলীর পটভূমিকায় একটি বিমুগ্ধা রমণীর রমণীয় কণ্ঠে এই গভীর বেদনা-মধুর কহিনী নিকোলাসের প্রাণের তন্ত্রীতে সকরুণ ঘা দিয়ে দিয়ে আর্তনাদ তুলতে লাগল। মানব-জীবনের সরল অনাড়ম্বর মহিমাকে মনের বেদীতে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য আরাধনা করে নিকোলাসের নিভৃত সত্তা। দারিদ্র্যের প্রতি আশৈশব মমতা তার। কিন্তু সে দারিদ্র্য হবে মহান সৌন্দর্যে শোভন। কল্পনা করতে ভাল লাগে—সে যেন একটি দৈবী-সুরে বাঁধা সংসারের কেন্দ্রে বসে আছে—যেখানে প্রাত্যহিকতার সব তুচ্ছতাই অন্তহীন কালের জ্যোতির্ময় আলোয় ভাস্বর। প্রতিদিনের অন্ন-ব্যঞ্জন, ডিসে সাজান ফলমূল, নিঃশব্দ বিলম্বিত একত্র ভোজন—এসব তার কাছে ধর্মের মহিমায় মহিমান্বিত। আর এই সব স্পিরিট-ল্যাম্প আর ফিরে গরমকরা রাঙাআলুর গল্প। লুব্ধ দাম্পত্য-সুখের বিনিময়ে এই আদর্শহীন ধর্মহীন গৃহস্থালীর বিরস দারিদ্র্য নিকোলাসের মনকে গভীর বিতৃষ্ণায় ডুবিয়ে দিলে।

নিরুত্তর রইল আগাথা। তার আর নিকোলাসের মধ্যে যে ভয়াল নিস্তব্ধতার প্রাচীর রচনা করে ফেলেছে সে, তা যেন তার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে নির্বাপিত করে দিল। স্খলিত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিল আগাথা। নিজের হাত সরিয়ে নিল না নিকোলাস। দুর্বোধ পুরুষের হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিল নারী। আগাথার

কম্পিত হাত যেন কোন্ দুর্বল প্রাণীর, বিষ-নখরে যার থর থর মৃত্যুভয়। আগাথার হাতের চাপ স্পষ্ট অনুভব করতে পারলে নিকোলাস। তবু নিজেকে গুটিয়ে নিল না সে। তার কাঁধে মাথা রেখে এলিয়ে বসে রইল আগাথা। খুলে ফেলে দিলে মাথার হাল্কা টুপি। বনস্পতির গুঁড়ির মত অনড় হয়ে তাকে বিপুল আশ্রয় দিল নিকোলাস।

মধুকণ্ঠে বললে আগাথা—'তোমার প্রাণের ছোঁয়া দাও আমায়। আমায় রোমাঞ্চিত কর।' অবাক হল নিকোলাস. সাহসিনীর ভঙ্গিমায়। তার শার্টের ভিতর দিয়ে বুকে হাত রাখল আগাথা। হঠাৎ নিকোলাস যেন তার অনাবৃত শরীরে অনুভব করল একটা প্রাণীর নখপীড়ন। বললে আগাথা—'কই পাচ্ছি তোমার বুকের সাড়া?'

ঐ শিলীভূত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন না জানি কেমন? ছোট ছোট দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ে আগাথার। এবার সে কি বলবে যেন বুঝতে পারে নিকোলাস।

আগাথা বলে—'আমায় একটি বার আদর কর। আমায় এ পর্যন্ত তুমি কখনো আদর করোনি।'

অধীর আগ্রহে নিজের মুখখানি নিকোলাসের মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে এল আগাথা।

—'না আগাথা'—বললে নিকোলাস—'না না। তোমার চোখ —তোমার ঐ দুটি চোখ আমার বড়ো ভাল লাগে।'

নিকোলাস যেন বলতে চায়, ঐ চোখ দুটি, তোমার ঐ চোখ দুটিতে শুধু অধর স্পর্শ করতে পারে—তাতে আমার বিমীষা হবে না। নিকোলাসের কথা শুনে আগাথার সারা দেহে সুখের রোমাঞ্চ হল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দুবের্নের বাড়ির ছায়াচ্ছন্ন চাতালে

অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ উঠল। এত লঘু সে-শব্দ যে দিগন্তে হেলে-পড়া ক্ষীণ শশিকলারও ভ্রম হল—সে শব্দ বুঝি ঘুমন্ত পৃথিবীতে হাওয়া-কাঁপা পাতার খসখসানি।

—'কি করছ তুমি—না, না—'

আদরে যে সময় ভুলিয়ে দেয় জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল মেরীর। কোন মতে নিঃশ্বাস নিয়ে বললে—'এ রকম চুরি করে আর ভাল লাগে না। মন ভরে তোমায় যদি পেতাম আরো কত সুখ পেতাম না জানি।'

'না না'—প্রতিবাদ করলে গিল্‌স—'না, না।'

পৃথিবীর প্রেমের যাদুতে সম্মোহিত হয়ে মস্ত টিউলিপ গাছের শিওরে চাঁদ বিমুগ্ধ শিশুর মত স্থির হয়ে রইল। প্রথম যৌবনের পূর্ণ নিবেদন নিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোরী। আর পুরুষ? স্বভাব সম্ভোগী পুরুষ সংযমের বাঁধ সতর্ক হাতে পাহাড়া দিচ্ছে। ঐ দুটি কোমল অবদ্ধ ওষ্ঠাধরে যে মধু, সেই মধু পান ভিন্ন নারীদেহের আর কোন রহস্য জানার চেষ্টায় ব্যাকুল আগ্রহ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে সে নিজেকে। নব কিশোরীর স্পন্দিত গ্রীবা বাহু বেষ্টনে জড়িয়ে সে যেন নিজের বিহ্বল আবেগকে বৃত্তায়িত করে রেখেছে।

—'তোমরা দুটিতে কি পাগল হয়ে গেছ? জান এখন রাত ক'টা?'

কখন চাঁদ অদৃশ্য হয়েছে আকাশ পট থেকে। চাতালের প্রাচীর গাত্রে আগাথার অস্পষ্ট ছায়া কাঁপছে। অপার মিলনের আনন্দে বিচ্ছেদের ব্যবধান ঘটল।

—'কাল—কাল নিশ্চয়ই দেখা হবে'—কম্পিত অনুরাগের সঙ্গে বললে গিল্‌স—'কোথায় আমি বুঝতে চাই না। দেখা হওয়া চাই-ই। তোমাকে এমনি করে বুকে না নিয়ে একটি দিনও কাটাতে চাইনে আমি।'

—'কাল দেখা হবে'—বার বার বললে মেরী—'কাল,—ওগো আবার কাল।'

যত দিন বেঁচে থাকবে দেখা হবে। শুধু কাল নয়। জীবনের প্রতিটি আগামী কাল।

পায়ে-চলা পথের দু'ধারে যে উইলোর ঘন বসতি তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল গিল্‌স। আর খাড়া পথে আগাথা এসে চাতালে পৌছল।

—'মা যেন ঘুমিয়ে থাকেন তা হলেই বাঁচি।'

—'কোন ভয় নেই। তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।'

আগাথার ঘরে এসে ঢুকল মেরী। যেমন জ্বেলে রেখেছিল তেমনি জ্বলছে বাতি। একবার মেরীর দিকে তাকাল আগাথা। দেখলে মেরীর অসম্বৃত ব্লাউজ, স্ফীত অধর, অবিন্যস্ত কেশের নীচে দুরবগাহ স্বপ্নিল চাউনি। হয়ত তিরস্কারের ভয়ে, হয়ত সোহাগ পেতে কিশোরী অনুরাগিণী আগাথার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের ভেতর নিজেকে লুকোলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে এল তার বাহু। বললে—'তুমি কাঁদছ মাদাম! কাঁদছ কেন? তবে কি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি? বল না মাদাম, এ তোমার সুখের কান্না, না দুঃখের?'

সে কথার কোন উত্তর দিল না আগাথা। সে যে এই কচি মেয়েটাকে ঈর্ষা করে তা নয়। কামনার জোয়ার কখন নেমে গেছে। জীবনের বেলাভূমিতে পড়ে রইল শুধু আনন্দহীন আকুতি। আশার কোন চিহ্নই আর নেই। চোখের জল মুছল না আগাথা। কে দেখতে পেলে কে পেলে না তার কান্না, তার হিসেব রাখার প্রয়োজন রইল না আর।

॥ ১২ ॥

চাঁদের ভাঙা টুকরোটি পরের দিন সন্ধ্যাবেলাতেও টিউলিপ শাখার অন্তরালে উঁকি দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু নৃত্যপরা পাতার মর্মরাণির সঙ্গে আজ আর কোন মিলন-মধুর লঘু শ্বাসের হাল্কা ধ্বনি তার কানে গেল না। পায়ে-দলা ঘাসের আস্তীর্ণ শয্যায় আজ আর বিমুগ্ধ দুটি অভিসারীর দেখা মিলল না। কোথাও কিছু অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়ই ভাবলে চাঁদ। সেই আচম্বিত বিপদের কথাই নিকোলাসের ঘরে বসে দুই বন্ধুকে বিশদ করে বিবৃত করছিল আগাথা। সেই দিন ভোরে মেরীর মায়ের এমন সাংঘাতিক ব্যথা ধরেছিল যে, বাধ্য হয়ে ছোকরা ডাক্তারকে খবর দিতে হয়েছিল। রোগের গুরুত্ব বুঝে সে আবার গিল্‌সের বাবাকে ডাকিয়ে আনতে উপদেশ দিলে। আসলে রোগিণীর মতামত নেবার কোন প্রয়োজন বোধ করলে না কেউ। গিল্‌সের বাবা ডাক্তার সালো মেরীর মাকে সোজা বোদোতে পাঠাবার উপদেশ দিলেন। সেই মত কাজও হল। ডাক্তার বললেন যে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। আরো অনেক আগেই তাকে পাঠানো উচিত ছিল। বাবার সঙ্গে মেরীও বাড়ি ছেড়ে গেছে।

মেরীর বাবা কত অনুরোধ করলেন, মিনতি করলেন কিন্তু কে কার কথা শোনে! যাবার বেলা মেরীর মা তাকেই বলে গেছেন দুটো দিন এ বাড়িতে থাকতে। জিনিসপত্র অগোছাল পড়ে রইল। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাকেই। এমন করে বলে গেলেন যেন আর বাড়িতে ফিরবেন না কোন দিন, এমনি একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গেছে মনে মনে। কি জানি হয়ত বা আসন্ন মৃত্যুর

ইশারা পেয়েছেন মানুষটি। আহ্, অমন শান্ত মনে বড়ো কেউ মৃত্যুর মুখোমুখী হতে পারে না।

গিল্‌সের সেই বিশিষ্ট চেয়ারটিতে মস্ত মহিমা নিয়ে বসে আছে আগাথা। যেন নিজের ঘরে রাজরাণীর মত শোভা ছড়িয়ে বসেছে। নিকোলাসের সঙ্গে আর তার কোন বাঁধন নেই। নিকোলাসের প্রাণের জগত থেকে সে স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা। আর তার জন্যে নিকোলাসেরও মনের কোন তারে কোথাও বেসুরা কিছু বাজছে না।

—'মেরীর মায়ের কথা ভাবছি আমি। তার আত্মার সদ্‌গতি—'

—'মেরীর মা? সে বিষয়ে কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই। ভগবানের সঙ্গে তাঁর সব সম্বন্ধের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন তিনি। নিজের জীবনের সব কিছু, এমন কি যে কটি বড়ো বড়ো দান-ধ্যানের কাজ তিনি করেছেন, যার খবর ত্রিভুবনে দু'জন ভিন্ন আর সকলের অগোচর—মানে তিনি আর তাঁর ভগবান শুধু জানেন—সে সব তিনি ভগবানের কাছে পৌছে দিয়েছেন। তবে মৃত্যুর পর যদি দেখেন যে, ভগবান সত্যি নেই, তাতেও খুব অবাক হবার মত মনের অবস্থা তার নয়। ওদের ধর্মাধর্মের মাপকাঠি আমাদের বুদ্ধিতে কূল পায় না।'

'কিন্তু মানুষের আত্মা ত মরে না। মেরীর মায়ের আত্মাও ত অবিনশ্বর'—বললে নিকোলাস অস্ফুট কণ্ঠে—'সবই তিনি দেখবেন শুনবেন। এইটাই সত্যি।'

'বাবা বলছিলেন'—গিল্‌স্ বললে—'বাবা বলছিলেন, যে ওর মার রোগ, বাবার যা সন্দেহ তা যদি সত্যি হয়, তবে ওর মার আর সেরে ওঠবার আশা খুব কম। তবে কটা দিন এখনও টানতে পারেন

হয়ত। সে যাই হোক'—মনের গোপন পুলক লুকোলে না গিল্‌স, বললে—'যাই হোক, নিয়তি আমাদের পক্ষেই দান ফেলেছে। এবার থেকে আনন্দেই কাটবে আমাদের সময়।'

তার কথা শুনে আগাথা মনে মনে ভাবলে যে, গিল্‌স যেন বলতে চায় যে, তাদের প্রেমাভিসারে আগাথার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

—'তা নয় আবার'—কথায় ঝাঁঝ মিশিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললে আগাথা—'ভাগ্যদেবী তোমার ওপ'র প্রসন্ন হচ্ছেন বৈ কি। হচ্ছেন না আবার? একটা বাধা তোমার সরে যাচ্ছে। এখন অন্তরায় বলতে শুধু রইলাম আমি।'

এই মুখরা মেয়েটির কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেল গিল্‌স। বললে —'তোমার কি অধিকার আছে শুনি, যে—'

উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে হাতব্যাগটা তুলে নিলে আগাথা। কটু কণ্ঠে জবাব দিলে—'আমার অধিকার কতখানি সেইটাই জানতে পারবে শীগ্‌গির। সেটা জানতে দামও দিতে হবে তোমাকে।'

হাত নেড়ে আগাথাকে নিবারণ করলে নিকোলাস।

—'কি বলছ তুমি, আমি ত কিছুই বুঝছি না। সব ব্যবস্থাই ত পাকাপাকি হয়ে গেছে। এখন আবার এ সব কি কথা উঠছে?'

নিকোলাসের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আজ আর চোখ নামালে না আগাথা। কতক্ষণ নিষ্পলক চোখে সোজা চেয়ে রইল তার দিকে। বললে—'যাই হোক, কথা পাকা ত?'

নিকোলাস মাথা নেড়ে সায় দিতেই আগাথা তাকে কাছে টেনে নিলে। যেমন তেমন করে তাকে জড়িয়ে নিয়ে আদর করতে লাগল। জানলার ধারে গিয়ে একলা দাঁড়িয়ে ছিল গিল্‌স। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে দু'চোখের আনন্দাশ্রু মুছে নিলে আগাথা।

—'তোমার কথায় আমি কোন দিন সন্দেহ করি নি। কিন্তু এখন আমি যাই। তোমার মা আমার পথ চেয়ে আছেন। বলে এসেছি যে, খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে যাব। আমার মুখে মেরীদের সব খবর শোনবার জন্যে তিনি এতক্ষণ ব্যাকুল হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আজ আমি তাঁকে আমাদের দু'জনের কথা সব খুলে বলব।'

—'আজ কেন? এর মধ্যেই কেন আগাথা?'

যেন একটা আচম্বিত ধাক্কায় আর্তনাদ করে উঠল নিকোলাস। কিন্তু আগাথাকে আজ যেন অবুঝ একগুঁয়েমিতে পেয়েছে। কোন কথাই সে শুনতে নারাজ। আর অপেক্ষা করার কি কারণ থাকতে পারে? হাতে সময়ও বড়ো অল্প। বোর্দোতে গিয়ে মেরীদের সঙ্গে তাকে থাকতে হবে। মেরীর বাবাও তার পথ চেয়ে বসে আছেন। তাকে যে কথা দিয়ে রেখেছে আগাথা যে দু'দিন পরেই সে আসছে তার কাছে। নার্সিংহোমে তাকে রাত দিন থাকতেই হবে। আগাথাকে ছেড়ে সে মানুষটি একটি মুহূর্তও থাকতে পারে না।

—'কি বলবে তুমি মাকে?'—মনের ভয় গোপন করতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীন কণ্ঠে বললে নিকোলাস।

—'সে তোমায় আমি বলব না। সন্ধ্যাবেলা মার কাছে গিয়ে সব শুনতে পাবে। তার জন্যে তুলে রাখলাম—বুঝলে?'

নাকের ডগায় একটু কুঞ্চন দেখা দিল আগাথার। অধরোষ্ঠের ফাঁকে স্মিত হাসি বিকশিত হতেই বড় বড় দাঁত দুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

—'তুমি আমার বাগ্‌দত্তা বধূ, সে কথা বলতে তোমার লজ্জা করবে না?'

এতক্ষণে সংশয়ের অকূল পেরিয়ে নিশ্চিন্ত কূলের আশ্বাস পেলে আগাথা।

একটা দুষ্টু হাসি হাসলে সে।

বললে—'সে আমার গোপন কথা। সে কথা আমি বলি?'

মনে কোন সংশয়-দ্বিধা নেই। বিজয়িনীর হাসি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আগাথা।

—'নীচে চললাম তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাত ন'টায় আবার দেখা হবে, জানো? ঠিক রাত ন'টায়—'

আগাথা ঘর থেকে বিদায় নিতেই গিল্‌সের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। রাগে ফেটে পড়ল যেন সে। বললে—'নোংরা মেয়ে মানুষ —কোথাকার একটা রাস্তার—'

তার মুখে হাত চাপা দিলে নিকোলাস। বললে—'ভুল করো না গিল্‌স। আগাথাকে তুমি একদম ভুল বুঝেছ।' তারপর কোমল নিষ্প্রভ গলায় বললে—'ও মেয়ে সত্যি যে কি, তা বুঝতে একটা পুরো জীবনের আয়ু ত আমার হাতে রইল—ভয় কি?'

—'তুমি ওকে ভয় করো। রীতিমত ভয় করো, আমি বলছি। যতই কথা চাপা দাও সত্যিটা আমি বেশ ধরতে পেরেছি নিকোলাস।'

নিজের মনের কথা অমন করে প্রকাশ করার কোন ইচ্ছা ছিল না নিকোলাসের। তবে কথা যখন দিয়েই ফেলেছিল আগাথাকে, কোন ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যে দেয়নি, একথা তার মত এমন নিশ্চিত করে আর কে জানবে? গিল্‌সের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল জানালার ধারে। কনুয়ে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল পরম ঔদাস্যের সঙ্গে।

এ বছর সোয়ালোদের দেশান্তরী হবার তোড়জোড় চলছে সকাল

সকাল। লেবু-গাছের ডালে ডালে তাদের জটলা বেড়েই চলেছে দিনে দিনে। যেন কী একটা অদৃশ্য লোভনীয় বস্তুকে ঘিরে তাদের অবিশ্রান্ত কলহ কচ-কচানির বিরাম নেই।

রাগ তার কেননা মেরীকে আজও নিজের বলে পায়নি গিল্‌স। আজও আগাথা তার পথের কাঁটা হয়ে আছে। মিথ্যে ভয় দেখানোর মেয়েমানুষ নয় আগাথা, সে কথা খুব ভাল ভাবেই জানে গিল্‌স। তাকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে মস্ত বোকামীর কাজ করে ফেলেছে সে। অত বড় ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত ছিল তার। মধুলোভী মাছিটাকে জালে আটকে ফেলতেই হবে, তুলতেই হবে পথের কণ্টক। ঐ মায়াবতী মেয়ের লুব্ধ কামনার আগুন থেকে শেষ অবধি বন্ধুকে সে নিষ্কৃতি পাইয়ে দেবে।

জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ারে সশব্দে বসে পড়ল গিল্‌স। দেখলে একখানা বই খুলে বসে আছে নিকোলাস। পড়ছে বলে মনে হয় না। নীচে থেকে আগাথার কলকণ্ঠ হাসির শব্দ ভেসে আসছে। তার মাঝে মাঝে একটা পুরুষালী গলার সাড়া পাচ্ছে নিকোলাস। বয়সের ভারে আজ-কাল মায়ের গলা ভারী হয়ে এসেছে।

কাকলী-মুখর সোয়ালো পাখিদের বিরতিহীন পাক খাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল নিকোলাস, কিন্তু দৃষ্টি ছিল তার অন্য দিকে। তাকিয়ে দেখছিল সে পড়ন্ত বিকেলের এক ঝলক রোদে এক-ঝাঁক মাছি অকারণে গুঞ্জন করে ফিরছে। সূর্যালোকিত এক একটি চঞ্চল প্রাণবিন্দুর মত। তার দৃশ্যমান জগত আবর্তেও এই সব ছুবের্নে, কাঁর‍্যা, প্লাসা, সালো আর মঁজি পরিবারদের উদ্দীপিত পরিক্রমা চলেছে। প্রাণজগতের সর্বনিম্ন স্তর থেকে মনুষ্য-সমাজ অবধি। ভাবলে নিকোলাস, সেই এক সুর, এক সাড়া, এক ঐকতান।

এই সব সময় প্রাণের গভীর অন্তস্তলে এক প্রচণ্ড অনুভূতির প্লাবন তার দোসর হারা নিঃসঙ্গতায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বলে বোঝাতে পারে না সে, কেন এমন ধারা হয় তার। মনের অপার রহস্যলোকে আত্মমগ্ন হয়ে যায় নিকোলাস। যখন সম্বিত ফেরে, দেখে প্রার্থনার ভঙ্গীতে করজোড়ে জানু পেতে বসে আছে সে।

কিন্তু এখন তা হল না। তার ঘরের জানালার সামনে আকাশের উদার মহিমাকে দেহরেখায় কলঙ্কিত করে যে বসে আছে, সে তার মিত্র নয়। কেন না তার ভগবানকে আড়াল করে আছে সেই লোক।

'গিল্‌স ?'

বন্ধুর সাড়া পেতেই গিল্‌স মুখ ফিরিয়ে বসল। তার রসহীন মুখে ঈশানের মেঘের ভ্রূকুটি দেখলে নিকোলাস।

'একটা সিগারেট ছুঁড়ে দাও ত'—বললে নিকোলাস—'আবার আমি সিগারেট ধরব। দেখি না কি হয় শেষ অবধি।'

—'প্যাকেটটাই থাক তোমার কাছে।' বলে বিদায় নিলে গিল্‌স। তাদের দীর্ঘবন্ধুত্বের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল যে, পরদিন দেখার কোন সময় ঠিক না করেই আজ চলে গেল সে।

কী একটা আশঙ্কায় নীচে নামতে সাহস হল না নিকোলাসের। ভয় হল, যদি যায়, আচমকা সে গিয়ে পড়বে মা আর আগাথার মধ্যে। ঘরের মেঝেতে এখনো অবাধ দুটি বিপরীত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে নিকোলাস। মায়ের থর থর পুরুষালী কণ্ঠের জবাবে আগাথার সেই মধুস্রাবী উচ্চহাস! এ হাসি ওর মুখের পোশাকী হাসি—আটপৌরে জীবনে কোন দিন এমন করে হাসে না আগাথা। আজ কতক্ষণ ধরে মায়ের কাছে বসে আছে আগাথা ভেবে অবাক

হল নিকোলাস। কি জানি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ে মানুষের মধ্যে তাকে নিয়ে কি স্থির হল।

কিন্তু সে নিজে?

সে-প্রশ্নের শেষ উত্তর জানে না নিকোলাস, জানতে চায় না। আপন চেতনায় একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নলোক রচনা করে তার মধ্যে সঙ্গিহীন বাস করার অভ্যাস করেছিল সে। দিনে দিনে সে আচ্ছন্নতাকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আপন খেলাঘরের মধ্যে আত্মমগ্ন তার মন এতদিন শুধু নিষ্ফল আরাম খুঁজেছে। কোথাও গিয়ে তার পরিত্রাণ নেই। তার সেই মাটির নকল গড়ে সংসারী জীবনের হানা দুর্বার হয়ে উঠছে। শত্রুপক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে দুর্গপ্রাচীরের খুব কাছেই।

দরজায় কার করাঘাত শুনে চমকে উঠল নিকোলাস।

—'আমি ভেতরে যাব না।' দ্বারান্তরাল থেকে বললে আগাথা। —'বলছি যে—'

দরজা খুলে তার সামনে এসে দাঁড়াল নিকোলাস। মিনতির সুরে বললে—'ঘরে এসো আগাথা—'

স্মিত মুখে মাথা নাড়লে দ্বারবর্তিনী।

—'এখন যাব না। সত্যি যাব না এখন। বলছি যে আজ সন্ধ্যায় বীথিপথে আমার অপেক্ষায় থাকবার দরকার নেই তোমার। আমি বরং এখানেই আসব। এই বাগানে বসেই গল্প করব দু'জনে। তোমার মা রাজী হয়েছেন জানো?'

কথা শেষ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল আগাথা। হয়ত বা নিকোলাসের প্রতিপ্রশ্ন এড়াবার জন্যেই মুখ ফিরিয়ে বিদায় নিলে। হয়ত বা প্রেমাস্পদের চোখের সেই আর্ত চাউনি দেখতে চায় না রমণী, যা দেখে তার মন ভয়ে কাঁপে।

॥ ১৩ ॥

মায়ের মুখোমুখী হয়ে বসেছিল নিকোলাস।

—'সন্ধ্যে হয়ে এল। আলোগুলো জ্বেলে দে না বাবা।'

মাকে একটি কথাও জিজ্ঞেসা করলে না নিকোলাস। সোজা প্রশ্ন করলে মা যে মেয়েলী চাতুরীতে এড়িয়ে যাবেন, তা ভাল করেই জানে সে। মা যখন মুখ খুলেছেন, কথার প্রবাহে বাঁধ দেবে না সে। আপনিই আপনাকে উন্মুক্ত করবেন তিনি।

—'আহা, কী মন্দ ভাগ্যি ও বাড়ির গিন্নীর! লোকে বলত বটে যে দুবের্নে-গিন্নীর বড় দেমাক। তা হবে নাই বা কেন? অমন পুরোনো বনেদী ঘরের বৌ, অত জমি-জায়গা জমিদারী। ও রকম বড়ো ঘরের বৌ হয়ে গেলে আমারই কি কম দেমাক হত? বেশী বৈ ত কম হত না। গিন্নী সরলে সবাই যে কিছু কেঁদে ভাসিয়ে দেবে তা অবশ্য নয়। আগাথা সে সব কথা তোকে কিছু বলেনি রে নিকোলাস? গিন্নী যখন মরবেই তখন কটা দিন সবুর করতে লোকের কি হয়? মরার আগেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা? কি জানি হয়ত বা ভগবান এতদিনে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। তবে একমাত্র ডাক্তার সালোঁই জানেন রুগীর অবস্থা কতদূর খারাপ হয়েছে। যে রকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, আগাথার মনে যে খুবই স্বস্তি বোধ হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?'

দুবের্নে-গিন্নী তার উইলে আগাথার নামে কিছু দিয়েছেন কি না, সে-কথা মাকে জিজ্ঞেসা করলে নিকোলাস।

মা হাত নেড়ে বললেন—'কিছু না, কিছু না। ওধার দিয়েই যায়নি—'

—'কি তুমি বলছ মা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'এর আর বোঝার শক্তটা কি। গিন্নী ভালো হয়ে উঠুক আর না উঠুক আগাথার বাবা বুড়ো কাঁল্লাঁর পুরো দেনা শোধ করে দেবে ঠিক করে রেখেছে। বেলমঁতের উপর আর কারুর কোন দাবী থাকবে না। তবে এ সবই হবে যদি বুড়ো তার মেয়েকে সব সম্পত্তি নিঃস্বত্ব দান করতে রাজী হয়। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু বুঝছিস কি রে নিকোলাস? তবে দ্যুবের্নে-গিন্নীই আগাথাকে হাতে করে এই সম্পত্তির দান তুলে দেবে, মেরীর বাবার কোন হাত থাকবে না এ ব্যাপারে।'

ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় নিকোলাস—'তা জেনে আমার কি লাভ হল, বল ত মা?'

—'শোন ছেলের কথা। লাভ হল না? লোকের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। সেটা তোর কম লাভ ভাবছিস? এখানকার লোকের জিভে যা ধার জানিস ত? একটা কিছু বলতে পেলে ত তারা ছাড়বে না। এখানে কে না জানে যে, মেরীর মায়ের হাতেই সব সম্পত্তি—তুই কিছু শুনছিস না নিকোলাস? কী যে নিজের খেয়ালে থাকিস, আমি ত কিছু বুঝি না তোর রকম সকম।'

যতখানি গভীর হতশ্রী দেখায় নিজেকে ততখানি নয় আগাথা, ভাবলে নিকোলাস। সে যে কি বিরাট সম্পত্তির অধীশ্বরী হবে তার সামান্য ইংগিত অবধি সে দেয়নি তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে। নিকোলাসের মায়ের মনকে ঐশ্বর্যের জৌলুষে চমকে দিয়ে জয় করে নেবার জন্যেই বুঝি এতদিন এমন সযত্নে আত্মগোপন করেছিল ছলনাময়ী।

একটু চুপ করে থেকে মা আবার প্রগল্‌ভা হয়ে উঠলেন।

—'গত বছরই আগাথার বাবা আটক পড়ে যাওয়াতে সব কিছু

ভেস্তে যাবার যোগাড় হয়েছিল। জমি-জায়গা বাগান দেখা-শুনা করার একজন বিশ্বাসী লোক তাদের দরকার হয়ে পড়েছে। বছর দুয়ের ফসল উঠে রয়েছে ঘরে, সে সব তদারক করা। অমন সোনার টুকরো জমি থাকলে দু'মুঠো খাওয়া-পরার জন্যে মোটে ভাবনা করতে হয় না। হিসেব করে দেখ না হাজার একর মতন জমি—তার মালিক শুধু একজন। তাই আগাথা আমায় বলছিল, আমি যদি গিয়ে—তুই অবিশ্যি এখুনি বলবি আমি কোন্ অধিকারে যাব ওর জমিদারী তদারক করতে। এই বুড়ো হাড় ক'খানা ওর জমিতে নিয়ে গিয়ে ফেলব? তুই যদি মন করিস্ বাবা—'

মা উঠে এসে ছেলেকে সোহাগ করে চুমু খেলেন। যেন ছেলের মন পেয়েছেন, এমনি গদগদ কণ্ঠে বললেন—'আমার সোনার গোপাল। লোকে যে বলে, ভালো মানুষের ভাঁড়ার ভগবান শূন্য রাখেন না, সে কথা খুব সত্যি, না রে নিকোলাস?'

সন্ধ্যা উতরিয়ে গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। আর একটু পরেই সারা শহর ঘুমে নিশ্চেতন হয়ে যাবে। একদিন এই শহরের কত ঐশ্বর্য ছিল, কত বড়ো ধর্মপাঠ ছিল এর গীর্জার বেদীতে, কত বার কত যুদ্ধের রঙ্গভূমি হয়েছিল এর বীথিপথ, রাজপথ। সে সব কথা ভুলে গিয়েছে আজকের অর্ধমৃত নগরের কূপমণ্ডুক বাসিন্দারা।

মা বললেন—'আমার সঙ্গে আয় নিকোলাস। একটা জিনিস দেবো তোকে—আয়।'

মায়ের পিছন পিছন রান্নাঘরে গিয়ে উঠল নিকোলাস। জামার পকেট থেকে একগোছা চাবী বার করলেন মা। বললেন—'আলোটা তুলে ধর না বাবা। দেখ দিকিনি কত বেঁটে তোর মা? শরীরে আর কিছু নেই। ক'খানা হাড়সার হয়ে গেছে। দে তো বাবা টুলটা আমার পায়ের কাছে।'

ড্রয়ারের ভেতরে হাতড়ে ফিরলেন মা। তারপর এক বাণ্ডিল কাগজ-পত্তরের নীচ থেকে বার করে আনলেন একটা কাগজের বাক্স।

—'দেখ দিকিনি বাবা!'

এর আগে আরো অনেকবার মা তাকে এই আঙটিটি দেখিয়েছেন। লাল পাথরের উপর হীরের কুচি বসান স্থন্দর একটি অঙ্গুরী। মা অন্তত বলেন যে, ওগুলো আসল হীরেই। তার পিসিমা ঐ একটিই জড়োয়া সম্পত্তি রেখে দিয়ে গেছেন এদের সংসারে।

—'আমাদের এখানে রেখেছিলেন কেন মা?'

—'তা কি জানি বাছা।'

রান্নাঘরটি তাদের পরিপাটি স্থন্দর। মাজাঘষা বাসন-পত্রগুলি উজ্জল দীপের আলোয় কেমন আশ্চর্য ঝকমক করছে। ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি রাখায় মা নিপুণ গৃহস্থালীর বড়াই করতে পারেন বটে, ভাবলে নিকোলাস।

—'ও আঙটি নিয়ে আমি কি করব মা?'

—'কী বোকা ছেলে রে আমার! এমন পুরুষের দিকে আবার মেয়েমানুষ ফিরে চায়? আজ রাত্রে বাগানে যাকে দেখতে পাবি, তার আঙুলে পরিয়ে দিস্ এই আঙটি। দেখিস বাবা, হারাসনি। বুড়ী মাকে তোর ভালবাসতে ইচ্ছা করছে না রে নিকোলাস?'

মাকে একটি ভালবাসার কথাও বললে না ছেলে। নিঃশব্দে মায়ের হাত থেকে আঙটি নিয়ে বদ্ধ মুঠির মধ্যে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ১৪ ॥

—'তুমি গরীব, একথা কেন আমায় বলছিলে আগাথা ?'

—'গরীবই ত আমি নিকোলাস। যখন প্যারিসে থাকব বেলমঁৎ থেকে একটি পাই-পয়সাও আমরা পাব না। আঙ্গুরের বাগান সর্বস্ব খেয়ে ফেলে জান ত। বেলমঁতে থাকলে কোন অসুবিধা হবে না—তবে একবার দু'জনে গিয়ে প্যারিসে বাসা করলে—।'

বাগানের চেনা লেবু গাছের গন্ধে-ভরা ছায়ায় বসে দু'জনে কতক ক্ষণ গল্প করলে। প্রিয় মানুষটিকে কাছে পেয়ে কত রকম করে বোঝাতে চাইলে আগাথা যে, কোন দিনই সে তার সঙ্গে ছলচাতুরী করতে চায়নি। তার প্রেম-বিগলিত গদগদ ভাষা শুনতে শুনতে নিকোলাস পকেটে রাখা আঙটিটি আঙুলের ডগায় ঘোরাতে লাগল। এখনো তাকে দেখায় নি বটে নিকোলাস, তবে আগাথার জানতে বাকি নেই কি অভিজ্ঞান আজ সে পাবে মনের মানুষটির কাছে।

—'তাই বলে ভেব না যে, তোমার মা আমাদের শুকিয়ে ফেলে রাখবেন। ভাল-মন্দ খাবার কখনো-সখনো পাঠাবেন বৈ কি ছেলে-বৌকে।'

—'দরকার কি আছে। তুমি স্পিরিট ল্যাম্পে আলু সিদ্ধ করে দেবে আর আমি তাই সোনা-মুখ করে খাব।'

—'সেই ভাল ডার্লিং'—কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটা খাদে নামিয়ে নিল আগাথা। ডার্লিং কথাটা শুনলে নিকোলাস যে অসন্তুষ্ট হয়, তা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অথচ নিকোলাসের কথার তীব্র পরিহাস মুগ্ধমতি রমণীর কানেই লাগল না।

সেই তরল অন্ধকারে হতশ্রী বাগানটির চারি দিকে তাকিয়ে

দেখতে লাগল নিকোলাস। সংসারের এই একটি দিকে কিছুতেই সে সুষমা আনতে পারেনি। হাঁস-মুরগীগুলো বাগানের কোথাও একটু-খানি ঘাস রাখতে দেয় না। সারা বছর ময়লার গন্ধে বাগানে বসা যায় না। গ্রীষ্মের আতপ্ত রাত্রে যখন বায়ু লেবুগন্ধবহ, তখনও এই বাগানে বসে একটু গা জুড়োতে পারে না নিকোলাস। এই মুহূর্তে আগাথার মনের সব কল্পনা-ভাবনাকে নিজের মুঠির মধ্যে পেয়েছে সে। তার একটি মুখের কথায় এই মেয়েটির মনের পাত্রে এখনি অমৃত উপচিয়ে পড়তে পারে। কিংবা সে নৈরাশ্যের ব্যর্থতার গভীর অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে এই মেয়েটির আকুতিকে। ভালবাসার বুকফাটা তৃষ্ণায় মরণমুখী ঐ মেয়েটিকে একটি মুখের কথায় সঞ্জীবনী সুধা পান করাতে পারে। এই মদির সন্ধ্যায় নিকোলাসের মনে সেই প্রলোভনই বলবতী হয়ে উঠল। বন্ধু গিল্‌সের জীবনে আগাথার কতখানি প্রয়োজন, সে কথা মনেই এল না নিকোলাসের। এই আবছা অন্ধকারে ঐ রূপহীনা মেয়েটির মুখ তার চোখে পড়ছে না, কিন্তু নিকোলাস জানে যে কান্নায় ভেসে যাচ্ছে সেই মুখখানি। অন্য কারুর অশ্রু-ভেজা মুখ দেখে সহ্য করতে পারে না সে।

—'কেঁদো না আগাথা। তোমার হাত খানি দাও আমায়।'

হাতের আঙুলে নিকোলাস যে আঙটি পরিয়ে দিলে, অশ্রুমুখী নিঃশব্দে তার আদর গ্রহণ করলে। প্রিয় মানুষটির করতলের তাপ সেই অঙ্গুরীর সঙ্গে তার চেতনায় সঞ্চারিত হল। কী একটা অনির্বচনীয় পুলকে রোমাঞ্চিত হল তনু। বাসনার প্রবল তরঙ্গভঙ্গে মনের বাঁধ চুরমার হয়ে গেল। তার প্রাণে নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ হল এত দিনে। এই মুহূর্তে ঐ কাছের মানুষটির কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন করতে চাইলে আগাথা, নিজের দেহকে আরতি-দীপ করতে চাইলে ওর প্রেমের, কিন্তু আত্মসংবরণ করলে আগাথা। এখন সে

যদি তুলে ধরে আপনাকে নিকোলাস তার দান গ্রহণ করবে না। তাই তার কুল-ভাঙা কামনাকে তীরের বাঁধে বাঁধল আগাথা—প্রাণের বাসনাকে ফল্গুর মত অন্তর্লীন করলে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমাস্পদের কপালে অধর স্পর্শ করলে আগাথা।

—'তোমায় দেবার মত আমার কিছুই নেই'—বললে নিকোলাস —'তার জন্যে আগেই তোমার মার্জনা চেয়ে রাখছি আগাথা। আমার কাছে তুমি বেশী কিছু যেন প্রত্যাশা করে থেকো না।'

—'আমি কিছু চাই না গো। শুধু তোমার কাছে কাছে তোমার ছায়ায় থাকতে চাই। তার বেশী সুখ আর চাই না আমি।'

যেন আত্মভোলা হয়েই বললে নিকোলাস—'কত ধৈর্য ধরতে হবে তোমায়। তুমি জানো না আগাথা, লোকের সঙ্গে মিশ খেতে আমার কত দেরী লাগে। কি জানি আমার মনের ভেতর কি একটা আছে—বলে তোমায় বোঝাতে পারব না আগাথা—সেই যে ভগবানের ছেলে বলেছিলেন না—ছুঁয়ো না তুমি আমায়। কি জানি তুমি আমার কথা বুঝলে কি না?'

বুঝলে বৈ কি আগাথা। ব্রীড়াময়ী নত কণ্ঠে বললে—'যত দিন না আমায় তোমার ভালো লাগে, আমি অপেক্ষা করে থাকব। অপেক্ষা আমি খুব করতে পারি। কত মেয়ে সংসারে কত কি পায় সহজে। তাদের শুধু নিজেদের টুকু হলেই চলে। কিন্তু আমার ত তা নয়। কত ধৈর্য ধরে কত সাধনা করে তবেই না তোমার জীবনে এতটুকু একটু জায়গার অধিকার পাব আমি। দেরী হোক, তবু একদিন আমিও সুখ পাব জীবনে তা আমি জানি।'

—'সুখ'—যেন কত বিষণ্ণ সুরে বললে নিকোলাস—'তুমি ভারী আশাবাদী আগাথা। এ সংসারে সত্যিকার সুখের সন্ধান পায় কে?'

কান্না ঠেলে আসছিল গলায়। নিকোলাসের কাঁধে ঠোঁট চেপে সেই কান্না দমন করলে আগাথা। গভীর আবেগে নিকোলাস এই অবাঙময়ীর নরম পাতলা চুলে ঠোঁট ছোঁয়ালে। কাছে টেনে নিলে আদর করে।

—'কী ভাল তুমি গো!'

ভাল! মনে মনে ভাবলে নিকোলাস—'তুমি আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছ। আমি নিষ্ক্রিয় বসে দেখছি। ভাল বৈ কি। ভাল নয় আবার!'

॥ ১৫ ॥

পরের দিন বোর্দোতে গিয়ে মেরীদের সঙ্গে মিলিত হল আগাথা। গিল্‌সও চলে গেল। বন্ধুকে বলে গেল বালুজে যাচ্ছে। এখন শিকারের মরশুম। এখন না গেলে সব আনন্দ মাটি। বন্ধুকে সে সম্পূর্ণ বানানো মিথ্যে বলে গেল বটে, কিন্তু নিকোলাস যে তার একটি বর্ণও বিশ্বাস করেনি তা ভাল করেই জানলে গিল্‌স। বোর্দোতে গিয়ে নিরিবিলি কোন একটা হোটেলে সাময়িক আস্তানা নেবে গিল্‌স, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। মেরী কি আর সারা দিন নার্সিং-হোমে বন্দিনী হয়ে থাকবে? আগাথার প্রথম চিঠি পেয়ে নিজের অনুমানের নির্ভুলতা বুঝতে পারলে নিকোলাস। আজ-কাল রুগ্না মায়ের সেবা থেকে ছুটি নিয়ে মেরী বেশ অনেকক্ষণ ধরে একলা বাইরে কাটিয়ে আসে। কোথায় যায়—কেন যায়, তা বুঝতে আর বাকি রইল না নিকোলাসের।

মেরীর মায়ের পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। তাঁর শরীরের যা গতিক হয়েছে তাতে তাঁকে আর তাঁর নিজের

বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। তবে হয়ত শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি আসতে আরো কিছু বিলম্বিত হতে পারে। মৃত্যুপথযাত্রিনীকে মুহূর্তের জন্যও একা ফেলে কোথাও যেতে পারে না আগাথা। প্রেমাস্পদকে তাই চিঠির দূতী পাঠিয়ে মনের আকুতি জানিয়েছে। তার সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে বিরহিনীর অধীরতা ফুটে উঠেছে। যে অধীরতা তার মনকে নিরাশায় ভেঙে ফেলছে দিনরাত।

আর আগাথার নৈরাশ্যে আশার আলো দেখতে পায় নিকোলাস। তার চিঠিগুলি পড়ে ভাবে, এবারকার ছুটি শেষ হওয়ার আগে হয়ত আগাথা এখানে ফিরে আসতে পারবে না কোন মতেই। মৃত্যুর এই দীর্ঘসূত্রতার অবকাশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে সে। নিজেকে কত সুখী মনে হল। পৃথিবীর একটি মেয়েমানুষের প্রাণ নিয়ে জীবনের বেলাভূমিতে মৃত্যুর সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত হয়ে আছে আগাথা। সে খেলা যেন না ফুরোয়, ভাবলে নিকোলাস। বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে এমনি ভাবে মেরীর মায়ের ভাগ্যসূত্র যদি অনন্ত কাল ঝুলে থাকে তাহলে আগাথার সঙ্গে আর দেখা না হয়েই সে ফিরে যেতে পারবে প্যারিসে। আগাথাকে বিয়ে করার যে অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে, তার পরে আর কিছু করতে চায় না নিকোলাস—ভাবতে পারে না। রোজ রোজ চিঠি পাঠায় আগাথা। সে সব চিঠি খুলে পড়ে নিকোলাস এই আশায় যে, আগাথার ফিরে আসার অন্তরায় সেই দু'টি কথা লেখা থাকবে তাতে। 'সেই রকমই আছে।' কথাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে নাচে নিকোলাসের চোখের সামনে। তা না থাকলেও চিঠি খুলে পড়ার মত উৎসাহ থাকত না তার। চিঠি খুলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সেই পরিচিত কথাগুলি খোঁজে নিকোলাস। দেখে মন তার হাল্কা হয়। তখন ক্যালেণ্ডারের পাতার উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। এখনও কুড়ি

দিন বাকি ছুটি ফুরোতে। আরো আঠার দিন। দিনে দিনে ছুটি শেষ হয়ে আসছে—তার পর আবার নতুন করে ক্লাস স্রুরু হবে।

তার মায়ের মনে আগাথা যে বীজ বুনে দিয়ে গেছে, তা অঙ্কুরিত হয়ে দিনে দিনে আগাছার মত বেড়ে উঠছে। মায়ের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হচ্ছে। সে ত স্পষ্ট চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে নিকোলাস। বেলমঁৎ জমিদারীর অধীশ্বরী হবেন মা। সেখানকার প্রজা ও প্রাণীদের আসল মালিকানা হবে তারই। তার মানে নয় যে, তিনি দাস-দাসী পরিবৃতা হয়ে রাণী-মা হবেন। বড় বড় ভোজ দিয়ে সালঙ্কারা হয়ে বসবেন সভা আলো করে। বড়ঘরের রাণী হবার সখ নেই আর। তিনি ত আর বড়ঘরের ঘরণী নন। তবে এ কথা সত্যি যে, ড্রয়িং-রুমের চেয়ে রান্না-ঘর থেকেই সব কিছুর উপর নজর রাখা সহজ। ইতিমধ্যেই তিনি জমিদারীর খুঁটিনাটি সংবাদ নিয়েছেন। বুড়ো বয়সে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হওয়ার পর আগাথার বাবা আর বাইরের কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না—জমিদারীর কিছুই দেখতে পারেন না।

'—যে মেয়ের উপর তার ভরসা সেই মেয়ে হবে আমার বেটার বৌ। তার স্রখ-শান্তি, জানিস নিকোলাস, এবার আমাদের হাতের মুঠোয়। তোর স্রখের জন্যে তাকে জমি-বাগানের ভাল-মন্দ বুঝে নিতেই হবে। বুঝে চলতেই হবে। অবশ্য তাতে-আমাতে যত দিন না মতান্তর ঘটে। আমার সঙ্গে বাছা তোমায় মানিয়ে চলতেই হবে—কোন অমিল কোঁদল যেন না হয়, সে তুমি দেখবে। কপাল ফিরছে দেখে লোকে অনেক কথা কানাকানি করবে। তা করুক তারা। তবে বড্ড দেরী হয়ে গেল রে। কপাল যদি ফিরলই ত এত দেরী হল কেন? বয়স গেল, বুড়িয়ে গেলাম। এত দিনে কি পোড়া বিধাতার মনে পড়ল রে? কিন্তু আমার কোন রোগ নেই—আমি

এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছি। ঐখানে গিয়ে এবার আমার বুড়ো হাড় ক'খানা একটু জিরুণি পাবে। এত দিনে জীবনের সাধ-আহ্লাদ একটু মেটাতে পারব।'

আগাথার চিঠি আসে দিনে এক বার। আর এই সব কথাবার্তা সব সময় লেগে আছে তার মায়ের মুখে। দেখে-শুনে নিকোলাসের মনের স্বস্তি ঘুচে যায়। মনে হয় কোথাও পালিয়ে গিয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অপরাধী যেমন নির্বিঘ্নে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে বিরাট নগরের জনারণ্যে মিশে গিয়ে বাঁচতে চায়, তেমনি প্যারিসের চিন্তা নিশি-দিন নিকোলাসের মনকে অধিকার করে বসে থাকে। প্যারিস তার আশ্রয়—প্যারিসেই তার মুক্তি।

আগাথার ধরণই আলাদা। একবার কলম হাতে পেলেই হল, বেহায়া মেয়েটার কোন সংযমের বালাই থাকে না। বন্যার জল যেন তট ছাপিয়ে উদ্দাম হয়ে আসছে—ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব-কিছুকে এলোমেলো করে দিয়ে। শূন্য পাতাটায় কি লিখে ভরে দিচ্ছে সে-সম্বন্ধে একটু সাবধানী নয় মেয়েটা। লজ্জা সরমের কথাও বোধ করি ভাবে না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হা-ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন লিখতে বসে আগাথা, মন তার ইচ্ছা-বিন্দু থেকে এক তিল নড়ে না।

রোজ চিঠি পেলেও দু'-তিন দিন অন্তর চিঠির উত্তর পাঠায় নিকোলাস। দু'-চারটে মামুলি কথা লিখে জানায়। তাতে একটুও নিরাশ হয় না আগাথা। নিকোলাসের কাছ থেকে কোন সোহাগ ভালবাসা না পেয়ে পেয়ে এমন অভ্যস্ত সে যে এই সব মধুহীন পানসে উত্তরে তার মন বেদনা বোধ করে না। নিকোলাস ভাবে—একবার প্যারিসে পাড়ি জমাতে পারলে হয়। তখন সপ্তাহে এক-আধ বার খবরের দানা ছড়িয়ে দেবে সে—তাই খুঁটে খুঁটে আগাথার মনের ক্ষিদে মিটবে। আগাথার কাছে যে প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে, তার

বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। শপথ ভাঙবে না। যতদিন না সেই আইডিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে, ততদিন অপেক্ষা করতে বলেছিল সে আগাথাকে। নিকোলাস ভেবে রেখেছে যে সময়ের ব্যবধানে আগাথার মনের আগুন কমবে, উত্তেজনা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে আসবে। তখন একটা নিরুদ্দাম প্রীতিতেই খুশী হবে আগাথা। কলেজের বন্ধুর মত বন্ধুত্বের আসঙ্গেই তৃপ্তি পাবে। মেয়ে-পুরুষে একটা রতিহীন মোহনায় সম্মিলিত হবে পরম আনন্দে। বর হিসেবে নয়, প্রিয়বর হিসেবে পেতে চাইবে তাকে।

কিন্তু নিকোলাস কী করবে? সেই 'কী' টা কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না সে, নিজের মনে তার সুস্পষ্ট ধারণাও করতে পারে না। তবে করবে সে, সে কথা সত্যি। শান্ত বৈরাগ্যে নিরুদ্বেগ চিত্তে সে কাজটা সমাধা করবে নিকোলাস। নিজের সত্তা থেকে জগতের অগোচরে, বোধ করি বা নিজেরও নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই পরমাশ্চর্য রূপান্তর সে ঘটিয়ে দেবে। সে নিদারুণ যন্ত্রণা সে জয় করবে সহজে।

তবু এখনও পনের দিন কাটতে বাকি। তারপর দশ দিন—। এই দশটা দিন পার হলেই সে হবে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ।

এমন সময় হঠাৎ একদিন তিন ছত্র লেখা চিঠি এল। মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এল একটা দুর্যোগের পূর্বাভাষ।

—'সব শেষ হয়ে গেছে। মেরীর মাকে কফিনে তোলা অবধি এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। তারপর কাল বাদে পরশু দিনই তোমার আগাথাকে বুকের পালঙ্কে পাবে।'

কফির পেয়ালাটা সামনে নিয়ে নিকোলাস বসেছিল রান্নাঘরে। ছেলের হাত থেকে চিঠিখানা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলেন মা।

—'যাক্ শেষকালে চোখ বুজল মেরীর মা। এই রকমটা

যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম। এতদিনে একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব আমি।'

সত্যিই এতদিনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

—'নিকোলাস কি সত্যি প্যারিসে ফিরবি বাবা? এ সময় চলে যাওয়াটা ভারি বোকামীর কাজ হবে কিন্তু।'

ইচ্ছা করলেই ত সে বিয়ের জন্য ছুটি নিতে পারে। বিয়েটাও সন্ত-সন্ত সেরে নিতে পারে। মিছিমিছি গাফিলতী করে লাভ কি?

নিরুত্তাপ প্রেত-গলায় মায়ের কথার জবাব দিয়ে নিকোলাস বললে, ভেবে দেখবে সে। নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখী করে দেখবে এক বার।

রাজপথে বেরিয়ে পড়ল নিকোলাস। আপন মনে বাইরের কুয়াশা-মলিন সূর্যালোকে হেঁটে যেতে লাগল। যেন নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যাচ্ছে। যেন কী একটা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে পড়ে গেছে তাই পালাবার পথ খুঁজছে।

বন্দী বিহঙ্গ সে। পিঞ্জর ভেঙে পালাবার পথ নেই। বৃথা চেষ্টা তার। সব তার পর হয়ে গেল, যা ছিল তার আপন, তার আত্মীয়। ঐ পচা কাঠ আর ঝরে-পড়া পাতার গন্ধ। আঙুরের সুবাসে ভুরভুরে বাতাস। শাখান্তরালে উড়ে-যাওয়া থ্রাস পাখির কাকলি। অলক্ষিত বিহঙ্গ-পক্ষধ্বনি কানে আসে, কিন্তু চোখে কিছু পড়ে না। সেই এতটুকু ছোটবেলা থেকেই শেষ সেপ্টেম্বরের মনোরম প্রকৃতি কত প্রিয় হয়েছে তার। এখন সে সব তার পর হয়ে গেল। খাঁচার পাখি যেমন লোহার গরাদে মাথা ঠোকে আর বনের কামনায় কেঁদে মরে, নিকোলাসের মন তেমনি ব্যথায় কাঁদতে লাগল। মনে হল তার আনন্দিত সত্তার এই বিনাশ, এ মৃত্যু যদি সত্যিকার মৃত্যু হত?

'আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। সদ্য-দেহমুক্ত আত্মাকে বিশ্রাম দাও হে প্রভু।'

সদ্য-মৃতের জন্য গীর্জার প্রার্থনায় যে অনন্ত বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি থাকে—সে যদি একান্ত সত্য হত? কিন্তু এই পরম শান্তির প্রার্থনায় কোন শান্ত সান্ত্বনা পেলে না নিকোলাস। সেই বিরাট নিরুত্তরের সমুখে দাঁড়িয়ে অনন্ত উত্তর পেল—'আলো, অতন্দ্র আলো—আলো আর আগুন।'

হাঁটতে হাঁটতে নিকোলাস চেষ্টনাট বীথিতে এসে দাঁড়াল। মনে পড়ল এই নিভৃত নির্জন বনস্থলীতে সে আর গিল্‌স কতদিন ব্যাঙের ছাতা অন্বেষণ করে ফিরেছে।

চিরদিনের স্বভাব যেমন আজও সে যন্ত্রচালিতের মত পা দিয়ে মরা পাতা ঝরা পাতা সরিয়ে দেখতে লাগল। নিজের ক্রিষ্টীয় বিশ্বাসের নিরেট পাথরের বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবার। তার মুমূর্ষু আত্মার পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কোনও পথে, এ বিশ্বাসে মন আর শক্তি পেল না। সংসার তাকে কোণঠাসা করে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এ শূন্যতা থেকে আর তার মুক্তি নেই। মোক্ষ নেই।

নিজের হাতে যে বোঝা সে পিঠে তুলে নিয়েছে সে-বোঝা তাকে হাসিমুখে বইতেই হবে। 'শত ধিক্ তোমাদের, কেন না তোমরা দুর্ভার দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ মানুষের পিঠে। তবু একটি অঙ্গুলি দিয়ে সে বোঝার এতটুকু হাল্কা করতে চাওনি।' করুণাময় ভগবান যে দিন এই মহাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন কী অপরিসীম ক্ষোভে না জানি তিনি বলেছিলেন—দুর্ভাগা তারা, যারা নিজের হাতে নিজের পিঠে ক্রুশ তুলে নেয়—যে ক্রুশ তাদের ধ্বংস করবে—যা বহন করার ক্ষমতা নেই তাদের—যে ক্রুশ তাদের

নিজের জন্যে নয়। কত নির্বোধ মানুষ নিজেদের শক্তির অতীত বোঝা মাথায় তুলে নেয়। বোঝার ভারে মুখ গুঁজে মরে। আত্মত্যাগের কথা মুখে বলা কত সহজ। কত সহজ প্রতিশ্রুতির নাগপাশে নিজেকে বেঁধে ফেলা। নিজের ইচ্ছায় লোহার বেড়ি পায়ে পরে লোকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় সেই শৃংখল টেনে টেনে। কিন্তু অপরাধীর পায়ের বেড়ি তার শরীরকে বাঁধে মাত্র, তার মনকে ত বাঁধতে পারে না। আর আমি? হা ঈশ্বর! এই মেয়েটা মৃত্যু দিন পর্যন্ত, হয়ত মৃত্যুর পরপারেও আমার দেহ-মনের উপর অহর্নিশি ভর করে থাকবে—। শুধু শরীর নয়, নিজের আত্মাকেও আমি নির্বোধের মত শৃংখলিত করেছি।

কী আশ্চর্য সংকল্প নিয়ে আগাথা প্রতিটি বাধার প্রাচীর অতিক্রম করেছে। মায়ের অসম্মতির কথা ভেবে নিকোলাস এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল। আগাথার প্রতি মায়ের বৈরিতার অন্ত ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য কৌশলে মাকে সে জয় করে নিয়েছে। এখন আর তার মুখের উপর এ স্বর্গের দ্বার ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিতে পারবে না সে। হায়! হায়! যা করে ফেলেছে কেন সে কাজ করতে গেল সে? নিজের উপর নৃশংস আক্রোশে মুঠি বন্ধ হয়ে এল তার। কে সে? যে তাকে ঘাড় ধরে এমন করে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে? গিল্‌স, তার বন্ধু গিল্‌স? অথচ এমনই ভাগ্যচক্র যে আগাথার সাহায্য ছাড়াই গিল্‌স সিদ্ধিলাভ করে ফেললে। ঐ তার বন্ধু গিল্‌স! মমতাহীন যার মুখের মধ্যে দুটি চোখ শুধু লোভে জ্বলজ্বল করে। রক্ত-মাংসের একটা জীবন্ত পিণ্ড, শুধু দেহ-ক্ষুধার তাগিদে ছুটে বেড়াচ্ছে সংসারের পথে। যে ক্ষুধার নিবৃত্তি তাকে দিতেই হবে। কিন্তু দোষটা কার, ভাবলে নিকোলাস। দোষ তার। দোষ একান্তই তার। চোখের সামনে সর্বক্ষণ একটা আদর্শের

প্রতীকমূর্তি তার থাকা চাই-ই। না থাকলে তার বৈরাগী চিত্তের তৃপ্তি হয় না। সেই ধ্যান আদর্শের পাদমূলে নিজেকে বলি দিয়ে নৈবেদ্য সাজাতে ভালবাসে সে। এবারও তাই হল তার জীবনে। ভালই হল, ভাবলে নিকোলাস। মূর্খ সে—বলি হওয়াই তার উচিত। সেই তার নিজের হাতে গড়া নিয়তি।

নিকোলাসের প্রকৃতিই তাই। তার অনুভূতি-প্রবণ চিত্তসরসীতে বেদনার ঘূর্ণী ওঠে। তবু সেই ঘূর্ণীতেই শেষ অবধি পাক খেয়ে মরবে না সে। তার ভিতর থেকেই একটা চরম মুক্তি সে আবিষ্কার করবেই। একটা সর্বশেষ আত্মাহুতির হোমাগ্নিতে তার আত্মা হয়ে উঠবে নিকষিত হিরণ্ময়। তার জীবন আগাথার ইচ্ছার ছককাটা পথে চলতে দেবে না সে। যতদিন না আগাথার সঙ্গে মালা বদল হচ্ছে, জীবনের এক জটিল ঘূর্ণীপাকে বাঁধা পড়ছে সে, যতদিন না বেলমঁৎ জমিদারীতে তার মা পাকাপাকি ভাবে জেঁকে বসতে পারছেন, ততদিন এ জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে পালানোর পথ নেই! এর চেয়ে বুঝি আত্মহত্যা সহজ। মনে মনে সে একটা দুর্ঘটনার কথাও ভাবতে চেষ্টা করলে, যাতে হবে তার অপমৃত্যু। এই চিন্তায় তার মনের ক্ষোভও অনেকটা নিস্তরঙ্গ হয়ে এল। কিন্তু গিল্‌সের বিরুদ্ধে একটা দারুণ বিদ্বেষ তার এই শান্তির আশ্রয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে লাগল। যে পথে ছোটবেলা থেকে তারা দুটিতে কত আনা-যাওয়া করেছে, সে পথে একলা চলতে চলতে আজ একথা তার বারে বারে মনে হতে লাগল—তাদের বন্ধুত্বে সে-ই চিরদিন প্রতারিত হয়ে এসেছে। আকাশমুখী গীর্জার চূড়ার চারি পাশে কুয়াশা আনা-গোণা করছে। শহরের চিমনীর ধোঁয়ায় এখন সেই কুয়াশা ঘন হয়ে উঠেছে। আশৈশব চেনা এই প্রিয় শহর যেন আজ মৃতের রাজ্য তার জীবনে।

॥ ১৬ ॥

দুর্গ-পাঁচিলের পাশ দিয়ে বাড়ির পথে ফিরল নিকোলাস। হঠাৎ পরিচিত কার ডাক শুনে থমকে থামল সে। উপরে চেয়ে দেখল তারই ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে গিল্‌স।

কে বুঝি গাড়ি করে বোর্দো থেকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বাড়ি অবধি যায়নি গিল্‌স—নেমে পড়েছে বন্ধুর বাড়ির দরজায়। কত কথা তার বলার আছে, সে সব কি আর এক সময়ের জন্যে ভুলে রাখা যায় না কি?

বালুজে শিকার করার কথাটা সত্যিই বানানো। ওটা মিথ্যা বলে গিয়েছিল গিল্‌স। দুটো হপ্তা বোর্দোতে যা কাটল সে আর ভাষায় প্রকাশ করার কথা পেলো না গিল্‌স। স্বর্গ, স্বর্গ। তবে ব্যাপারটা একটু বিশ্রীও হয়ে গেছে তাদের ভেতর। মানে, মায়ের নার্সিং-হোমে ত হাঁফিয়ে উঠেছিল মেরী। তার মাও তাকে রাখতে চাইছিলেন না ঐ ভাবে দম বন্ধ করে। বাইরে খোলা হাওয়ায় মেয়েকে পাঠিয়ে দিতেন জোর করে। দু'জনে দেখা করার কোন অসুবিধে ছিল না। মানে, বাগানে বাগানে, ডকের ধারে—সর্বত্র দু'জনে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছে। অবশ্য স্টেশানের ধারের ঐ হোটেলটায় কখনো যায়নি তারা।

—'ক'দিন দিব্যি চলছিল। শত প্রলোভনেও হার মানিনি দু'জনে। জানি ত, এ বয়সে ঘরে একলা হলে কি হতে কি হবে··· আর শেষ অবধি হলও তাই। খুব খারাপ লাগছিল পরে। আমার ত বটেই—মেরীও বলছিল সেই কথা। মনে মনে লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা ছিল না দু'জনকার। মনে একটা অপরাধী ভাব আর

কি! ক'দিন পরেই যা ভাল ভাবে পেতাম তা যেন চুরি করে নিলাম। তাছাড়া ঐখানে ওর মা মৃত্যুশয্যায় আর মেয়ে হয়ে সে কি না—অবশ্য তা বললে কি হয়? সুখের পথে অমন কত পাপ গায়ে লেগে যায়।

তোমায় বলতে আমার কোন লজ্জা নেই নিকোলাস, যত বার সেই কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে যেন আর এই মাটির পৃথিবীর মানুষ নই আমি। তুমি বুঝবে না নিকোলাস—এ একটা কিআশ্চর্য আবিষ্কার। মানে আমায় যেন যাদু করে ফেলেছে ঐ মেয়েটা।'

মুখ তুলে তাকালে না অবধি গিল্‌স। চিরদিনের মত আজও আপন মনে প্রাণের কথা বলে যেতে লাগল। চেয়েও দেখলে না শ্রোতা তার শুনছে কি না—তার কিছু বলার আছে কি না এ সব ভেবে দেখবার স্বভাব কোন দিনই নয় তার। চিরদিনের মতই বন্ধুর নৈঃশব্দের পটভূমিকায় আজও রং-তুলি দিয়ে মনের কথা এঁকে যাচ্ছিল গিল্‌স। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হতে মুখ তুলে তাকাল গিল্‌স। আজকের নীরবতার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেসুরো বাজতে লাগল তার আত্মমগ্ন মনেও। দেখলে বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে নিকোলাস। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখছে দেয়ালের গায়ে। বন্ধুর চুলের গোছা ধরে তার মুখখানা তুলে ধরতেই হুঁস হল তার। আজকের অস্বাভাবিকতার কারণটা তখন বুঝতে পারলে গিল্‌স। তাই অবাক কণ্ঠে বললে—

—'কি হল কি তোমার? আগাথা এসব হাত তুলে দেয়নি তা তোমায় আগেই বলে রাখছি। আগাথার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই তার কাছে তোমার কোন বন্ধনও রইল না এর জন্যে। আমি তোমার কাছে যেটুকু আত্মত্যাগ চেয়েছিলাম তার দরকার হল না, বুঝলে ত? তুমি ত আর সত্যি তাকে বিয়ে করবে বলে পাকা

কথা দাওনি। যেটুকু কথা হয়েছে তার মধ্যে অনেকখানি ফাঁকির অবকাশ রয়ে গেছে, অনেকখানিই অনির্দিষ্ট। আর তোমার ইচ্ছেও ত তাই ছিল যে দরকার হলে সরে দাঁড়াতে পারবে। তা ছাড়া আর কিছু তোমার মনে থাকতে পারে এ আমি কোন দিন বুঝিনি বা বুঝতে চাইনি।

ঐ হাঙ্গর মেয়েটা তোমায় গিলে খাবে আর আমি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখব, এ কথা স্বপ্নেও ভেব না নিকোলাস। ও মেয়ে সত্যি যদি তোমার বৌ হয়ে ঘরে আসে, জিনিসটা কি রকম দাঁড়াবে কোন দিন সত্যি ভেবে দেখেছ নাকি তুমি? নিজের কথাটাই খালি ভাবছ —ঐ লোভী মেয়েমানুষটার কথাটাও ভেবে দেখো। তোমায় বিয়ে করা মানে ওর তিলে তিলে আত্মহত্যা করা। কি তোমাদের এমন হয়েছে যে তোমায় না পেলে ও মরে যাবে? তুমি ত্যাগ করলে প্রাণে বাঁচবে না? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? ও সব বাক্ চাতুরী আমি ঢের জানি। ও রকম মেয়েছেলের ঝুলিতে ওসব দু-চারটে ভানুমতীর খেল থাকেই। বিশ্বাস করো, ও রকম মেয়েমানুষের রীতি-নীতি আমার ঢের জানা আছে। সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না বন্ধু। মোটে মাথা ঘামাতে হবে না।

তুমি ওকে বিয়ে করলে ওর জীবনে মিথ্যে একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হবে। তুমি হবে ওর কাঁটা,—চলতে ফিরতে সর্বদা খচ-খচ করবে কাঁটাটা। দু'জনেই মরবে—দু'জনেরই দুর্দশার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে থাক না ও মেরীর বাবার কাছে—স্ত্রী মারা যেতে ভদ্রলোক এখন সদ্য বর সেজে বসেছে। কি ভাবছ তুমি? তোমার সঙ্গে একটা মুখের কথা দেওয়া আছে তাই—নইলে দেখতে সোজা ঐ বুড়োটার পাশে কনে সেজে দাঁড়াত তোমার আগাথা। সারা শহরে

ত এখন ঐ কথাই কানাকানি হচ্ছে। তুমি কিছু শোননি? আশ্চর্য করলে যে বন্ধু! বোধ হয় তুমিই কানে তুলো দিয়ে আছ।

অবশ্য ওদের মধ্যে কিছু একটা ঘটাঘটি হয়েছে তা আমি বলছি না। কিন্তু হাওয়া যেমন চলেছে তাতে বুঝতে কিছু বাকি নেই লোকের। এই যে 'বেলমঁতে'র মস্ত বড়ো জমিদারিটা এক কথায় ঐ মেয়েটার হাতে তুলে দিয়েছে সে বুঝি নিছক ভালমানুষী বন্ধুত্বের দায়ে?

আগাথার ওপর একটু মমতা পড়েছে বুড়োটার। পড়লে আশ্চর্য হবার খুব কিছু নেই। সব মেয়েমানুষেরই জীবনে একবার ভালবাসার সুযোগ আসে—তা সে আগেই হোক আর পরেই হোক। বুড়োটা সব কাজেই ওর বুদ্ধি নেয়—পরামর্শ শোনে। সব সময় দু'জনে বসে আছে—কত রকম গালগল্প হয়। কাগজে পড়ে পড়ে আগাথার কাছে সব গল্প করে শোনায় মেরীর বাবা। আগাথার মতে উনি হলেন এখানকার একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ মানুষ। আমাদের মত নিতান্ত গেঁয়ো ভূত নয়।

এই ব্যাপারটা নিয়েই তুমি অক্লেশে জল ঘুলিয়ে দিতে পারবে। রীতিমত একটা জোরালো যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে আগাথার কাছে। বলতে পারবে অবিশ্বাসের কাজ করেছে আগাথা। তোমার মান-সম্মানের হানি করে দিয়েছে আগাথা, সে আমি বুঝতে পারছি নিকোলাস, কিন্তু খুব ক্ষতি তোমার হয়নি এখনো।

তুমি কিছু ভেবো না। কাল সন্ধ্যেবেলা বাবার গাড়িতে করে তোমায় আমি পৌছে দিয়ে আসব। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে যখন তুমি থাকবে প্যারিসে তখন মেরীর মায়ের কফিন নিয়ে সে ডোর্সে এসে হাজির হবে। এসে দেখবে পাখি পালিয়েছে। তারপর প্যারিস থেকে গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখে পাঠাবে তাকে। আমি

ত থাকছি এখানে। বেশী ভেঙে পড়লে সান্ত্বনা দিয়ে একটু সামলে দেবো 'খন।

অবশ্য তোমার মায়ের কথাটা ভাববার। বুড়ো মানুষের মনটা ভেঙে যাবে। তা সে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে 'খন। বলবে, প্যারিসে কিছু কাজকর্ম আছে, সেরে না এলে বিয়ে করা অসম্ভব তোমার পক্ষে। মানে ঐ রকম একটু কিছু বানিয়ে বললেই হবে। তারপর প্যারিস থেকে তাঁকেও একখানা চিঠিতে সব বুঝিয়ে লিখে দেবে। মায়ের সুখের জন্যে তাই বলে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে পারো না ত তুমি।

আগাথাকে নিরাশ করার চেয়ে বরং নিজের জীবনটা নষ্ট হতে দেবে! কি পাগলের মত বকছ তুমি নিকোলাস? কি ভাবো তুমি? আগাথার বুড়ো বাবা যতই অথর্ব হয়ে পড়ুক না কেন সে কখনো এরকম ব্যাপার সহ্য করবে না। অমন মেয়েকে এক হপ্তার মধ্যে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেবে। ওর বাবাকে বহুকাল ধরে আমার বাবা দেখছেন। ও যে কি চীজ তা আমি ভাল করেই জানি। নিজের ভোগ-জাতে কেউ এসে ভাগ বসাবে মুখ বুজে সে অপমান সহ্য করার মানুষ সে নয়।'

গিল্‌স যত কথা বললে তার মধ্যে ক'টা হাঁ হাঁ ছাড়া কথা বলার অবকাশ পেলে না নিকোলাস। এত কথার পরেও বন্ধু গিল্‌সের সুপরামর্শ সে যেন প্রাণ ভরে মেনে নিতে পারলে না। বার বার নিজের কথা দেওয়ার ওপরই জোর দিতে লাগল।

শুনে রাগে গরগর করতে লাগল গিল্‌স। বললে—'ছাড়ো ত ও সব। আমি যেমন বলছি তেমনি করো। অমন মেয়েকে মন থেকে সরিয়ে ফেলো। ও ব্যাপারের ইতি করে দাও।'

তাই করবে। ইতি করেই দেবে। ভাবলে নিকোলাস। ভেবে

মন তার অনেক হাল্কা বোধ হল। এত দিনে তার ভাবনার পুঞ্জীভূত মেঘের অন্তরাল থেকে জলদর্চি রেখার ইংগিত পেল সে। আলো এল। কুয়াশার তমিস্রা ভেদ করে তার আকাশে সূর্য দেখা দিলেন। এ রাত্রির অন্ধকারকে কোন দিন বুক দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফেলতে পারত না নিকোলাস। বুকের ওপর চাপা হিমালয়ের ভার টলাতে পারত না একলা। গিল্‌স আজ প্রিয় বন্ধুর কাজই করলে। সে তাকে বাঁচালে। মৃত্যুর পঙ্ক থেকে নবজীবনের আলোয় টেনে তুলে নিলে।

তবু নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল নিকোলাস। বললে তার ত বিবেক বলে একটা বস্তু আছে।

একদিন আগাথাকে উদ্দেশ করে যত জোরে গিল্‌স বলেছিল যে তার হৃদয়ের বালাই নেই, ততোধিক সশব্দে ফেটে পড়ল আজ বন্ধুর কাছে। বললে—'বিবেকের বালাই নেই আমার।'

করাত কলে অনেক রাত্রে বাঁশীর ভোঁ দিল। এতক্ষণ অবধি বিবেকের বৃশ্চিক দংশন সহ্য করলে নিকোলাস। তারপর মা খেতে ডাকলেন। তখন হুঁস হল তার।

আজ সারা সকাল নিকোলাসের মা অস্থির হয়ে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। যেন বন্ধ খাঁচার মধ্যে একটা প্রাণী মনের অদম্য কৌতূহল নিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে। মায়ের পায়ে হাল্কা চটি। আসছেন যাচ্ছেন শব্দ হচ্ছে না। ছেলের ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে কান পেতে পেতে কিছুই শুনতে পেলেন না তিনি। দু' একবার আগাথার নামটা শুনতে পেলেন যেন মনে হল।

ঐ গিল্‌স ছোকরাটি যে তাঁর রাঁধা ভাতে ছাই দিতে বসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই নিকোলাসের মায়ের। অবশ্য গিল্‌সকে

দোষ দিতে পারেন না তিনি। কাল সারা রাত ঐ দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হয়নি। বাতি জ্বেলে দিয়ে এসেছেন ঘরে। অথচ কাল সন্ধ্যায় যে প্রত্যাশায় মন ছিল রোমাঞ্চিত আজ তাই যেন বুকের মধ্যে খচ-খচ করে বিঁধছে। কি জানি, একটা মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছে না ত তার নিকোলাস। নিশ্চিত করে কেউ কি কিছু বলতে পারে? হয়ত বেলমঁতে গিয়ে তার চিত্তে সুখ থাকবে না। তখন কি হবে তার ভাগ্যে? নিজের বাড়ি যে তার হাতের মুঠোয় পাবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? শ্বশুর এই সম্পত্তিটুকু করেছিলেন। সেই বাড়ি এখন নিকোলাসের ভোগ দখলে—সেই সঙ্গে বাৎসরিক কিছু আয়। ছেলে তাও এনে মায়ের হাতে তুলে দেয়। এমন স্বভাব-সরল ছেলে, এইটুকুই যে তার পৈত্রিক সম্পত্তি তা যেন বুঝেও বুঝবে না।

আর এ কথাটাই বা কে বলতে পারে যে, ঐ আগাথা মেয়েটারই লোভ নেই এই সম্পত্তি বাড়ি ঘরদোরের ওপর? হয়ত এই বিয়েতে রাজী হওয়ার উদ্দেশ্যই তাই। আবার তখুনি আপন মনে মাথা নাড়লেন। তা হবে কি করে? ওর নিজেরই বেলমঁতে অত বড় সম্পত্তি। তবে একটু চোখ-কান খুলে রাখা দরকার। ও মেয়েকে বৌ করে নিয়ে এসে ওর কাছে কিছু শিখে পড়ে নেবেন তিনি—ভাবলেন নিকোলাসের মা।

সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন চার হাত এক করে দিতে পারলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। সার্লোঁদের ঐ ছেলেটাকে পথ থেকে সরাতে না পারলে তার সব সাধে বালি পড়বে। বরং টেলি করে আগাথাকে এখানে ডেকে পাঠালে হয়। 'শীগগির চলে এসো'—এর চেয়ে অল্প কথায় অবশ্য আর টেলি পাঠানো যায় না। তাই পাঠাবেন তিনি আগাথাকে। ডাক-ঘরের ঐ নতুন পোষ্টমাষ্টার মেয়েটার

একটু সন্দেহ হবে বটে, তবে সে নতুন আমদানী এখানে। এখানকার শহুরে জীবনের হালচালের কোন খবর রাখে না।

বিকেল বেলা রান্নাঘরে তরকারী রান্না করছিলেন। মুখ তুলে দরজায় আগাথাকে দেখে এক রাশ বিস্ময়ে চোখ ভরে উঠল।

—'এরি মধ্যে?'

হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ। বাঁ গালে কালো মতন একটা কিসের দাগ লাগা। ছোট টুপির অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মাথার চুলগুলো যেন আছাড়ি পাথাড়ি করছে।

—'ওপরে আছে?'

জবাবে নিকোলাসের মায়ের সমর্থন পেয়ে বুকটা অনেক হাল্কা বোধ হল আগাথার। আজ সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই সে এসেছে। তার ছক-বাঁধা পরিকল্পনার কোথাও কোন ফাঁক রাখেনি সে। থাকলেও মনের জোরে তা ভরাট করে নেবার কৌশল তার অজানা নয়।

মায়ের কথার বিরাম নেই। কাল সন্ধ্যার দিকেই প্যারিসে যাবে নিকোলাস। তাকে আটকাবার জন্যে আগাথা প্রায় পূরো দু'দিন হাতে পাচ্ছে। যদি পারে সে, তার হাত-যশ। তবে এমন কিছু ভাবনার নেই তার? প্যারিসে যাচ্ছে তবে ফিরছে ত?

—'যাবে আর আসবে আর কি?'—বললেন মা।

—'তাই বলেছে বুঝি আপনাকে?'

—'বলেছে ত তাই—তবে সে না বলারই মতন বাছা। বললে প্রফেসারের সঙ্গে দেখা না করে তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ছুটি নিতে হবে—কাগজপত্তর সই-সাবুদ আছে। ওখানে কাজ-কর্মও কিছু সেরে আসতে হবে।'

—'এই সব কৈফিয়ৎ দিয়েছে বুঝি আপনাকে?'

—'তোমার কথাবার্তা আজ বড়ো হেঁয়ালি বোধ হচ্ছে, বাছা। সব কথা কিছু খোলসা করে বলেনি আমায়। তবে আমার মনে হয় এই রকম—'

—'সেই কথাটাই ত জানতে এসেছি। জানতে যাচ্ছিও এখন।'

—'জানতে এসেছ? তোমার সবই যেন কেমন জোর জবরদস্তি।

রান্নাঘর পরিষ্কার করছিলেন। মুখ তুলে দেখলেনও না তার দিকে তাকিয়ে। বললেন—'চাওয়াটাই বড়ো নয় আগাথা, সংসারে হওয়াটাই বড়ো—'

যেন কত মিষ্টি গলায় বললে আগাথা।

—'ও কথা আমায় শোনানোর মানে কি?—'

—'মানে? মানে কিছুই নেই। আমার দিকে অমন করে চেয়ে দেখছ কি বাছা? আমার নিকোলাসকে আমি যেমন জানি তেমন আর কে চেনে? সে ত আমারই পেটের ছেলে। অমন মিষ্টি স্বভাবের ছেলে একালে হয় না। তবে কি জানো, ওরও ত পুরুষ মানুষের শরীর—রাগ-ঝাল ত থাকবেই।'

এর পর অসহ্য বোধ হল আগাথার। রাগ দেখিয়ে বললে—'নিকোলাসকে আর আমায় চেনাতে হবে না আপনাকে। একলাই আছে ত?'

একলা বই কি। জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা করছে। যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে আর কি? যা কিছু ওর সম্পত্তি সব নিয়েই ত চলল। এই বাচাল মেয়েটা যে তার মাতৃত্বের দাবিকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। সেই আক্রোশে কটুকণ্ঠে বললে—'যে ভাবে যাচ্ছে বোধ হয় আর ফেরার ইচ্ছা নেই।'

হাতের কাজ থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন নিকোলাসের মা।

ঘর দুয়ার শূন্য—আগাথা ততক্ষণে সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে।

—'ঐ ডোবা অবধি নিয়ে যাবে বাছা। ঘোড়া তোমার জল খাবে না। মরে গেলেও না।'

কান পেতে শুনলেন ওপরের ঘরের জিনিস নাড়াচাড়ার শব্দ। হড় হড় করে একখানা চেয়ার সরে গেল। তার পিছনে একটা ট্রাঙ্ক বুঝি হটর হটর করে সরালে কে। তারপর কথা কাটাকাটির আওয়াজ আসতে লাগল। তখন মুরগীর মত এক পাশে হেলে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন তিনি।

॥ ১৭ ॥

—'মেরীর মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে আবার ফিরে আসতে হল আমাকে'—বললে আগাথা—'বাড়িতে খুব ভিড় হবে। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন সব আসবে। তা তুমি হঠাৎ এখান থেকে চলে যাচ্ছ, কই সে সম্বন্ধে আমাকে ত একটি কথাও জানাও নি?'

ডালা হাট-করে-খোলা ট্রাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস। নিজের ভয় সম্বন্ধে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতে লাগল সে। ছোট ছেলের মত যেন কি একটা অন্যায় করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—'আমার কিছু কাজ আছে প্যারিসে।'

—'ফিরবে কবে?'

ঠিক এমনি কর্তৃত্বের সুরেই আগাথা কথা কয় মেরীর সঙ্গে।

আগাথা হল আসলে সেই জাতের গভর্নেস, যারা কোন কিছু হাল্কা ভাবে নিতে জানে না।

অধোবদনে জবাব দিলে নিকোলাস। বললে—'এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরব মনে হয়।'

বিছানার উপরে অবিন্যস্ত ছড়ানো জামা-কাপড়, স্যুট, বইপত্তরের দিকে তর্জনী উদ্যত করল আগাথা। ভৎ'সনার কটাক্ষ নিক্ষেপ করলে নিকোলাসকে।

—'আমি এখনও মুক্তপুরুষ। কোন বাঁধনে বাঁধা নই আমি কারুর কাছে'—বললে নিকোলাস।

—'কথাটা খোলসা করেই বল না।'

আগাথার কণ্ঠস্বর শুষ্ক রসহীন হয়ে উঠছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস। একটা ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল, কিন্তু সেই ফাঁদের নিশ্চিদ্রতায় হঠাৎ যেন একটা পালাবার পথ দেখতে পেলে নিকোলাস। এই অপ্রত্যাশিত সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলে না সে। বললে—'খুব ভাল কথা। যদি সত্যিই শুনতে চাও আগাথা—আমি বলতে গররাজী নই।'

—'কি হয়েছে তোমার'—বললে আগাথা—'কি হয়েছে বল? যে ক'দিন ছিলাম না তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে। বল কি হয়েছে?'

নিকোলাসের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকে দেখছিল আগাথা। চোখের পাতা নেই মেয়েটার। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে নিকোলাস। বলল—'ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছ ত? যাও হাত মুখ ধুয়ে এস।'

একটু অপ্রতিভ হয়ে আগাথা আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়াল

একবার। তার পর অসহিষ্ণু হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—'তাইতে এত বীতরাগ তোমার ?'

—'তা ছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে। এই যে শুনছি ডুবের্নেরা তোমায় একটা মস্ত যৌতুক দিচ্ছে। তাতে ডোর্থের লোকেরা কী সব বলাবলি করছে, শুনেছ নিশ্চয় ?'

—'কার কথা ? আমার আর মেরীর বাবার ?'

নিকোলাসের আপত্তির কারণটা শুনে এতক্ষণে আশ্বস্ত হল আগাথা। মুখে হাসি দেখা দিল তার।

—'আমি অবশ্য সে-সব রটনা বিশ্বাস করি, তা তুমি মনে করো না। তুমি আর মেরীর বাবা'—অবিশ্বাস ভরে শরীরটা একটু দুলিয়ে নিয়ে বললে নিকোলাস—'তাও কি কখনো হয় ? না ও-রকম কথা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারো না। ঐ সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করব ততটা বোকা ঠাউরো না আমায়।'

—'বুঝেছি গো, বুঝেছি।'

নির্বোধ পুরুষ। পালিয়ে বাঁচবার একটি মাত্র পথও নিজের হাতে বন্ধ করে দিলে নিকোলাস। যা মুখ ফস্‌কে বলে ফেললে, সেই কথার সূত্রে ফিরে আসার জন্যে মিথ্যে মাথা খুঁড়তে লাগল।

—'লোকের রটনার শেষ নেই। আমার অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। যাই হোক, আমি ত মুখের কথা দিয়েছি। বাগদত্ত হয়েছি।'

নিকোলাসকে ভারি করুণ দেখাচ্ছে। আগাথার মনে হল তার বুক থেকে যেন একটা জগদ্দল নেমে গেল।

—'এতক্ষণে বুঝলাম তোমার মাথা ব্যথার কারণ—'পুনরাবৃত্তি করলে আগাথা। অলক্ষ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুশীতে হাল্কা হল।

'ভারি অবুঝ পুরুষ তুমি আমার'—বলে বিশ্রী ভাবে তাকে সোহাগ করতে গেল। যেন অশুচি কি একটা তাকে জড়াতে আসছে এই ভাবে পিছলে সরে গেল নিকোলাস। কিন্তু আগাথার মনে আজ কোন ক্ষোভ অভিমান নেই। যেন কত দুষ্টুমির ভঙ্গীতে আদর করে নিকোলাসের গায়ে সে থাবড়া দিলে। বললে—'একটু সইতে পার না তুমি, এমন অবুঝ পুরুষ নিয়ে মেয়ে মানুষ কি ঘর করতে পারে? দুষ্টু, সোনা আমার। তবে তোমার আগাথার মনের জোর দু'জনের সমান। ভেবেছ বুঝি তোমার জন্যে বেলমঁৎ জমিদারীর লোভ আমি ছাড়তে পারব না? ওগো না। তোমার আমার মধ্যিখানে কোন জমিদারীর পাঁচিল আমি তুলতে দেবো না। তেমন মেয়ে তোমার আগাথা নয়।'

নিকোলাস যাই বলুক আর যাই করুক না কেন, আগাথা তার মুষ্টি কিছুতেই শিথিল হতে দেবে না। আর আশা রইল না নিকোলাসের। হালে আর পানি রইল না।

ও-রকম করে হাসলে কি নোংরা কুৎসিত দেখায় আগাথাকে। ঐ রকম করে নাকের ডগা কুঁচকে বড়ো বড়ো দাঁত বার করে হাসলে। তবু আজ খুব হাসলে আগাথা। অমন করে হাসতে আর কখনো দেখেনি তাকে নিকোলাস। কী অনির্বচনীয় মমতায় আগাথা তার দু'টি বাহু বাড়িয়ে দিলে নিকোলাসের দিকে। ঐ দু'টি বাহুর মুক্তিতে অনিন্দ্য সমর্পণ চেয়ে দেখলে নিকোলাস। আগাথার অবাঞ্ছিত শরীর থেকে যেন একটা বিকশিত প্রেমের নিবেদন আসছে তার দিকে। তবু তা গ্রহণ করলে না নিকোলাস। নিঃশব্দে সে নিবেদন ফিরিয়ে দিলে।

—'এ সব রটনার এক বিন্দুও যে তুমি বিশ্বাস করনি জানি আমি। তবু এ কথা ঠিক যে, লোকের নানা রটনায় ভয় পেয়ে গিছলে তুমি।

না না আমায় বলতে দাও—বাধা দিও না। একথা তোমাকে বলতে আমার কোন লজ্জা নেই যে আমার জীবনে আজ তুমি ছাড়া আর কেউ নেই—কিছু নেই। মেরীর বাবা যত ভাল মানুষই হন, যত আন্তরিক ভাবেই তিনি আমায় সম্পত্তি দান করতে চান—আমি তা প্রত্যাখ্যান করব। ও কাহিনীর ইতি করে দিলাম আমি। এ নিয়ে আর মাথা খারাপ করো না। তোমার-আমার মিলনের এ বাধা আমি চিরদিনের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলাম।'

সত্যিই কি আগাথা ভেঙ্গে ফেললে সব বাধার প্রাচীর। ভাবলে নিকোলাস। তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অন্তত আগাথার মনে আর কোন সংশয়ের কণ্টক রইল না।

—'তোমার কি মাথা খারাপ হল আগাথা'—মনের কথা প্রকাশ করতে কথা ঠেলাঠেলি হতে লাগল নিকোলাসের মুখে। বললে—'তুমি ছেড়ে দেবে বললেই হল? তোমার এ রকম আত্মত্যাগে আমি কি করে সহজ মনে সম্মতি দিতে পারি বল? যখন জানি যে আমি নিজে তোমায় কিছু দিতে পারব না। দেবার মত কিছু নেই ত আমার। সে ত তুমি জান, কিছু মাত্র দেবার ক্ষমতা নেই আমার।'

একথার গভীর অর্থ বুঝতে পারলে কি না আগাথা তা বোঝা গেল না।

তার নিকোলাস যে টাকাকড়ি-সম্পত্তির কথাই বলছে এমনি ভাণ করলে আগাথা। তাই নিকোলাসের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে—'কিছু নেই বলে কেন আমায় দুঃখ দিচ্ছ তুমি। তোমার কিছু নেই সেই আমার ভাল। আমাদের দু'জনের জগতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কোন কিছুর দরকার নেই।'

ছলনাময়ীর মুখে সেই আশ্চর্য হাসি লেগেই আছে, দেখলে নিকোলাস। দুটি হাত আর একবার তার দিকে প্রসারিত করে

দিল আগাথা। অক্টোপাশের মত যেন নিকোলাসকে জড়িয়ে ধরতে এল। একটা কদর্য বিভীষিকায় শিউরে উঠল নিকোলাস। ঐ হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করার আগে যদি কোন অস্ত্র দিয়ে ঐ হাত দুটোকে কেটে দু'খানা করে দিতে পারত, বেঁচে যেত সে চিরদিনের মত।

—'তোমায় আমি মিথ্যে কথা বলেছি আগাথা'—যেন আর্তনাদ করে উঠল নিকোলাস—'একটা বিশ্রী বিভীষিকা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে তোমায় আমি মিথ্যে অজুহাত দেখিয়েছিলাম।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো নিকোলাসের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। তা হোক, তবু বলে ফেলে যেন অনেকটা আরাম পেল সে। একটা বোঝা নেমে গেল বুক থেকে। সব চেয়ে চরম আঘাত হানল সে অবশেষে।

শুনে আগাথার শরীর যেন শিথিল হয়ে গেল। অসহায়ের মত হাত দুটি নামিয়ে নিলে। ঘরে ঢোকার পর যে কালো ব্যাগটা চেয়ারে রেখেছিল তা থেকে একখানা রুমাল বার করে ভালো করে নিজের মুখখানা মুছে নিলে আগাথা। তার পর আবার প্রতিবাদী পুরুষের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল শক্তিময়ী। ভাবলে আজ শেষবারের মত ঐ মানুষটার মনের ভয় ঘুচিয়ে দিতে হবে। মায়ের স্নেহের ছায়ায় এতদিন থেকে হয়ত বা তার নিকোলাস নিজের সংসার পেতে তার দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছে। অনেক পুরুষ মানুষই প্রথম প্রথম, এমনি ভয় পায়। কিন্তু আগাথা তার ভয় ভেঙে দেবার জন্যে তৈরী হল।

শান্ত কণ্ঠে নিজেকে খুলে ধরলে আগাথা। আশ্বাসের স্বরে বললে—'যে ভয়ের কথা তুমি ভাবছ নিকোলাস তা আমি জানি। কিন্তু সে ভয় নেই তোমার আমি বলছি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তোমাদের বাগানে বসে যখন আমায় তুমি নেবে বলেছিলে সেদিনও

ত তুমি কোন লুকোচুরি করনি। বরং নিজের কথা বুঝিয়ে বলতে ভগবানের বাণী আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিয়েছিলে—স্পর্শ করো না আমায়। আমার আত্মার অধিকার চেয়ো না। আমি তোমার মন জানি। ওগো আমার কাছ থেকে তোমার কোন ভয় নেই। আমি ত তোমায় কত বার বলেছি, আমি কোন কিছুরই প্রত্যাশী নই। শুধু তুমি আমায় আশ্রয় দাও। তোমার ছায়ায় থাকতে দাও আমায়। সেদিনও তোমার কাছে আমি শুধু সেবার অধিকার চেয়েছিলাম। আর তাই না বিশ্বাস করে তুমি এই আংটি নিজের হাতে আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলে।'

কী আশ্চর্য কোমল মিনতি বাজতে লাগল আগাথার কণ্ঠস্বরে। করুণ মিনতিতে বশ করার কত যাদু। একটি হাত তুলে আঙুলের সেই আংটি দেখাল আগাথা। এ ক'দিনে নতুন এমন কিছু ঘটেনি তাদের দু'জনের মধ্যে যার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিকোলাস তাকে বর্জন করার কথা ভাবতে পারে। আগাথার কথার প্রত্যুত্তরে বলবার মত একটি কথাও জোগাল না নিকোলাসের মুখে। বিজয়িনী আগাথা তবু থামল না। তেমনি নরম অনুনয়ের স্বরে আবার বললে—'ওগো, তোমার সেবা করার অধিকার শুধু ভিক্ষা দাও আমায়। আর কিছু চাই না, শপথ করে বলছি। আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার আগাথার।'

—'সত্যি বলছ? সত্যিই আর কিছু চাও না তুমি?'

যে নিকোলাস প্রাণ খুলে হাসে না কখনো সে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

—'আর কিছুর প্রত্যাশী নও? যে বিভীষিকার কথা তোমায় বলেছিলাম সে কিসের জানো? তোমার হাতে নিজেকে দোবো

বলেছিলাম, তাই ভয় ছিল, সত্যি তুমি বুঝি আমার সর্বস্ব চেয়ে বসবে।'

তারপর গলা আরো নীচু পর্দায় নামিয়ে বললে—'কিসের ভয়? সে কথা ভেঙে বলবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। সে চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। সে তুমি বুঝবে না। তুমি আর আমি। তোমার আমার মধ্যে যে কোনদিন দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে তা আমি ভাবতে পারি না। কিছুতে ভাবতে পারি না।'

মনের ভিতরকার প্রধূমিত বহ্নি যেন তার কথায় জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগল। শান্ত মেজাজের মানুষ যখন হঠাৎ রেগে ওঠে সে বুঝি এমনি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আজকের আগে আর কখনো নিকোলাসের স্বভাবের এই রূঢ় দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আগাথার। একটা দারুণ ঘৃণায় ফেটে পড়ল নিকোলাস। অনেক দিনের চাপা আক্রোশে যেন অগ্ন্যুৎপাতের মত বিদীর্ণ হল।

—'তোমার কাছে না যাই, ঘৃণায় তোমায় না ছুঁই, তবু তোমার সঙ্গে আছি এ চিন্তা আমার অসহ্য। একদিন দু'দিন নয়, আমার সমস্ত জীবন তোমার সঙ্গে কাটবে—তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। জানো আগাথা, তার চেয়ে বরং মরে তোমার হাত থেকে বাঁচব।'

আগাথার গলা থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্ত স্বর শুনলে নিকোলাস। সে যে কি বলতে চায় তার সঠিক মর্মার্থ বুঝেছে আগাথা, তা যেন মনে হল না। তেমনি অনুনয়ের স্বরে বললে—'না না, অমন করে বলো না। তোমায় হারাতে হবে আমার, ও-কথা মুখে এনো না।'

কিন্তু এখন সে নিকোলাস আত্মবশীভূত নয়। গলার আওয়াজ আরো এক পর্দায় তুলে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বরে সে বললে—'হারাবে কেন? হারাবার কথা আবার কিসের? পেলে কবে যে হারাবে? যা তোমার অধিকারে ছিল না কোনদিন তা হারাবার আফশোষ হবে

কেন? তোমার আমার মধ্যে অনেক আকাশের তফাৎ আগাথা—অনেক সমুদ্রের ব্যবধান।'

কথার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে আগুন ধরাতে লাগল নিকোলাস। মুক্তির আশায় নির্বিচারে আঘাত করতে লাগল।

—'কেড়ে নিও না'—মিনতির স্বরে বললে আগাথা—'সব কেড়ে নিয়ো না আমার কাছ থেকে। অন্তত মধুমতী লেরো'র তীরে আমাদের সেই রাতের মধুস্মৃতিটুকু আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকতে দাও।'

কিছুতেই না—আগাথা তার অধিকার কিছুতেই শিথিল হতে দিতে চাইছে না। দেখে নিকোলাস আরো নির্মম হয়ে উঠল।

—'সত্যি কথাটা আজ তুমি জেনে যাও আগাথা। তোমাতে আমাতে কত অমিল সেই রাত্রেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হতেই পারে না।'

কান পেতে শুনলে, বুক পেতে যেন মৃত্যু-শেল নিলে আগাথা। বিবর্ণ মুখে ক্লান্ত গলায় শুধু বললে—'তবে সেদিন কেন কথা দিয়েছিলে? কেন শপথ করেছিলে?'

আর বলতে পারলে না আগাথা। বাক্ রোধ হয়ে এল তার। সেই মুহূর্তে আগাথাকে জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারত নিকোলাস। কিন্তু নিজেকে তার যেন ঘৃণ্য মনে হ'তে লাগল। সে যেন বজ্র মুষ্টিতে একটি দুর্বল প্রাণীর গলা চেপে ধরেছিল। হঠাৎ করুণা ভরে সে মুষ্টি শিথিল করে দিলে নিকোলাস। বললে—'এ অসহ্য আগাথা। এ কি করছি আমি?'

ভয়ার্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নিকোলাস সামনের ঐ অসহায় মেয়েটির দিকে। আজ হঠাৎ যেন তাকে কত অচেনা মনে হল। যেন কত অজানা মনে হল তার।

কী অধিকারে তাকে এত দুঃখ দিচ্ছে সে? ভাবতেই একটা স্নিগ্ধ মমতায় ভরে উঠল মন। বললে—

—'পাগলের মত কী সব বলে ফেলেছি আগাথা। ও আমার মুখেরই কথা। একটিও আমার মনের কথা নয়। যা সব বলেছি তার একটি বর্ণও সত্যি নয়, তুমি বিশ্বাস কর আগাথা।'

আগাথার সরু কাঁধের পিছনে হাত দিয়ে নিকোলাস তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলে। গলা বুজে আসতে শব্দ করে হাঁফ নিতে লাগল আগাথা।

—'হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম আমি। হয়ত এলো-মেলো কিছু বলেও ফেলেছি তোমায়। কিন্তু তোমার ভালর জন্যই আমি বলছিলাম কথাগুলো।'

এতক্ষণ প্রাণহীন পুতুলের মত শুনছিল আগাথা। নিকোলাসের মুখে একথা শুনে হঠাৎ অসহ্য রোষে রুদ্রাণী হয়ে উঠল সে। নিকোলাসের বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে—'আশা করি, এরপর একথা বলবে না যে এতক্ষণ এ ঘরে যে অভিনয় করলে সে-সবই আমারই মঙ্গলের জন্যে।'

দুটি হাত অঞ্জলি করে রোষময়ীর রাঙা গাল দুটি ফুলের মত তুলে ধরল নিকোলাস। স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে বলল—'তাকাও আমার দিকে। আমি বলছি আগাথা মুখ তুলে চাও আমার মুখের দিকে। শোন। আমি তোমার জীবনে অনন্ত দুঃখের কারণ হতাম। তুমি আর আমি—আমরা দু'জনে হতাম দু'জনের জল্লাদ। বল, আমি ঠিক বললাম—না ভুল বললাম?'

কান্না-ধরা গলায় বললে আগাথা—'যদি এই তোমার মনে ছিল, তবে তা বুঝতে এতদিন লাগল কেন? বলো এতদিন পরে এ-সব কথা বললে কেন?'

—'দেরী হয়েছে ঠিক। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ, খুব বেশী দেরী করে ফেলিনি আমি। আবার নতুন করে তোমার জীবন রচনা করার পক্ষে খুব বেশী দেরী আজও হয়নি।'

আর একবার আগাথার কাঁধে হাত রেখে নিকোলাস তাকাল তার চোখের দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিলে আগাথা। নিকোলাস যে মেরীর বাবার প্রতি ইংগিত করছে তা বুঝতে পারল না সে।

—'আবার নতুন করে? কি বলছ গো তুমি—তোমাকে ছেড়ে?'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আগাথা। তপ্ত অশ্রু বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগল তার শুষ্ক গাল বেয়ে। বেদনায় বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ। হয়ত করুণায়, হয়ত বা লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ল নিকোলাস। তবু আগাথার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। যেন হৃদয়ের কোন তন্ত্রীকে কে আলগা হাতে স্পর্শ করেছে তার। আগাথার হাত ধরে তাকে বিছানার উপর বসাল নিকোলাস। নিজে বসল। তার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—'সত্যিই আমার কারণ আছে, আগাথা। আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার সেই ভীষণ ইচ্ছাশক্তির যুপমূলে বলি হয়েছি আমি। যে ইচ্ছাশক্তি তোমাকে অনমনীয় পশুশক্তির মত যে কোন বাধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করে। তুমি আমার দুর্বল আপত্তি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছ কিন্তু কখনো লক্ষ্য করেছ কি তারা আবার পিছনে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে? বল না, এসব সত্যি নয় কি?'

—'সত্যি। বুঝতে পারছি আমার দোষ কোথায়'—লজ্জিত আবেগের সঙ্গে বললে আগাথা।

নিজেকে নির্মম শাস্তি দিতে চেয়েছিল নিকোলাস। তার উপায় আবিষ্কার করেছিল মনে মনে। এতদিনে সে শাস্তির পাল্টা ভাবলে

সে। নষ্ট হয়নি। জীবনের ধন কিছুই নষ্ট হয়নি প্রভু। যা সে হতে চায় তাই হবে সে। আজ থেকে হবে অন্য মানুষ।

—'আমি ভাল হবো। চলে যাবো তোমার কাছ থেকে—এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করছি। জীবনে আর কোনদিন তুমি আমায় চোখে দেখতে পাবে না। আমার কথা শুনতে পাবে না। শুধু এইটুকু তুমি জেনে যাও যে যেখানে তুমি যাবে সেখানে আমিও যাবো। কোনদিন কোন অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব না মনে মনে।'

আগাথার কথা শুনে আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিলে নিকোলাস। তার জীবনে যাকে সে মৃত বলে মনে করেছিল, দেখলে সে মেয়ের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই তার। আগাথার কাছ থেকে সরে বসল নিকোলাস। ক্লান্ত কটু কণ্ঠে বললে—'আর কেন মিছে আগাথা। এবার তোমার বোঝা উচিত যে তোমার আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে। শেষ হয়ে গেছে সব।'

মুখের কথা যেন বর্শার ফলার মত এই অবুঝ মেয়েটার মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চেষ্টা করলে নিকোলাস। মনে কোন প্রীতি দাক্ষিণ্য রাখলে না।

—'আর কি করে বোঝাব যে তোমার আমার খেলার পালা শেষ হয়ে গেল? কত রকম করে ত তোমায় বোঝালাম। আর আমি পারছি না, আমায় ক্ষমা করো আগাথা। এতদিন ধরে আমার প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে তুমি যে লড়াই করেছ তার জন্যে তোমার কাছেই আমার মার্জনা প্রাপ্য। তুমি আমায় ক্ষমা করো আগাথা। দয়া করে মুক্তি দাও।'

একথা শুনে আগাথা ঋজু কঠিন হয়ে দাঁড়াল। চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই দুটি চোখে যেন মরুর আগুন ঝক-ঝক

করতে লাগল। দুটি ঠোঁট চেপে এক পা এগিয়ে এল আগাথা তার দিকে। তারপর সাপের মত উদ্যত ফণায় ফোঁস করে উঠল।

—'আমি তোমায় ঘৃণা করি না? তোমাকে দেখে আমার বিতৃষ্ণা হয় না? কোন্ মেয়ে তোমায় দেখে ঘৃণা না করবে শুনি?'

তার কথাটা যে উল্টো করে বুঝলে আগাথা, এ তার ভালই হল ভাবলে নিকোলাস। আগাথা ওকে পাঁকে ঠেলে নামাচ্ছে। এতক্ষণে হার মেনেছে নারী। হেরে যাচ্ছে তা বুঝেছে বলেই না তাকে নিন্দা করতে নেমেছে।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল নিকোলাস—'আমার সম্বন্ধে তোমার ঐ ধারণাই যদি সত্যি হয় আগাথা তবে আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তুমি বেঁচে গেলে। তোমারই ত উল্লসিত হবার কথা।'

জানলার কাছে সরে এসে দাঁড়াল নিকোলাস। নীচে বাগানে মা কাচাকাচি নিয়ে ব্যস্ত আছেন এমনি ভাণ করছেন। আগাথা তার কাছে এগিয়ে এল বুঝেও মুখ ফিরে তাকাল না নিকোলাস।

—'যে নোংরা জানোয়ারটা তোমার মন ভাঙ্গিয়েছে—ব্যবহার করেছে তোমায় নিজের কার্যসিদ্ধির আশায়, আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি সেও পাবে না। তোমার পীরিতের বন্ধু ঐ সার্লোঁদের ছেলেটা মেরীকে পাবে না, যত চেষ্টাই করুক।'

একটুও বিচলিতের ভাব দেখাল না নিকোলাস। বললে—'সত্যি বলছ?'

—'দেখে নিও'—বলেই চেয়ারের উপর বসে পড়ল আগাথা। আবার ব্যাগের ভেতর রুমাল হাতড়াতে লাগল। অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস। অভিনয় যে শেষ হয়েই গেছে তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেইখানে বসে বললে আগাথা —'আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন তোমায় বিরক্ত করব না।'

নিকোলাস ফিরে এল জানলার কাছে। দেখলে মা বাগান থেকে কখন চলে গেছেন। সেইখানে দাঁড়িয়ে লেবুগাছটার দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর যখন মুখ ফেরালে, ততক্ষণে আগাথার চলে যাবার কথা। তার বদলে দেখলে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চোখের মণিতে সংহত করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে আগাথা। চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে—তার নিটোল মুখের ব্যঞ্জনাকে। সে চোখ ফেরাতেই শেষ বারের মত আগাথা উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে—এগিয়ে এল দরজার দিকে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়েও কেন জানি ইতস্তত করতে লাগল।

—'তোমার এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি কি করতে পারি তা একবার ভেবে দেখার ইচ্ছেও তোমার হয় না? এমন নির্দয় বটে পুরুষের মন।'

জানলায় কনুইয়ে ভর দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস। আগাথার কথায় কোন সাড়া দিলে না। আগাথা আবার বললে—'আমি যে আত্মহত্যা করতে পারি এ ভয়ও করে না তোমার?'

তবু ফিরে তাকালে না নিকোলাস। যেন অন্ধ বধির হয়ে গেছে। কোন মানুষের কোন কথা তার কানে গেল না। কাউকে দেখতেও চাইলে না। যতক্ষণ না স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে আগাথা চলে গেছে ঘর থেকে ততক্ষণ নড়ল না সে। তার পর মুখ মুছল রুমাল বার করে। তার দেওয়া আংটিটা আগাথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে মেঝেতে, সেটাও কুড়িয়ে নেবার ইচ্ছা হল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে চেয়ে রইল পলকহীন চোখে। দেখতে লাগল তার আসল মানুষটাকে।

॥ ১৮ ॥

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সাড়ম্বরে হওয়ারই কথা ছিল। অবশ্য খাদ্য-তালিকায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। বরং আয়োজন ছিল সাধারণ ছিম-ছাম। কিন্তু সাধারণকে কি করে অসাধারণ করে নিতে হয় ডোর্থের লোকেরা তা ভাল করেই জানে। একজন আত্মীয়া ঠিকই বলেছেন—ভেড়ার মাংসের কথা যদি বলতে হয় একমাত্র ডোর্থেই দেখেছি যেখানে সুসিদ্ধ মাংস পাতে পড়ে। কিন্তু সেদিন কেমন যেন একটা বিষাদের মেঘে থম-থম করেছে উৎসবের আকাশ। খাওয়ার টেবিলে আগাথাই কর্ত্রীর আসনটি অলংকৃত করেছে—ডুবের্নে পরিবারের সেই ত আজ প্রতিভূ। আগাথাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন শোকের পাষাণ প্রতিমা। তাই অতিথিরা বিরাট আয়োজন সত্ত্বেও খাওয়ার আনন্দ পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারলে না। শ্রাদ্ধ-বাসরে আজ এই কথাটাই সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে যে মৃতা ডুবের্নে-গৃহিনী আগাথাকে সত্যিই ভাল-বাসতেন অতি গভীর ভাবে। শোকবতীর বিষাদাচ্ছন্ন চেহারাটি দেখেও কারুর মনে আর কোন সংশয় রইল না। মেরী না আগাথা কে বেশী শোকাহত ডোর্থের লোকজনদের কাছে সেইটাই বিস্ময়কর লাগল। বাইরের আচারে ব্যবহারে লোকের বিচার করতে যাওয়া যে কত ভুল পদে পদে আজ তা প্রমাণিত হল। চোখের নোনা জল যেন এ্যাসিডের মত আগাথার চোখের পাতা খেয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছে সে। কিন্তু সত্যি কথা হল যে একটা দুরারোগ্য চর্মরোগের দরুণ আগাথার চোখ

এমনিতেই সব সময় লাল থাকে। তাই বেশী সমবেদনা আগাথার ভাগ্যেই জুটল আজ।

একজন নিমন্ত্রিত মহিলা সকলকে শুনিয়ে বললেন—'যাই হোক আজকের এই শোকের মধ্যে এইটা সুস্পষ্ট হল যে আগাথার ভাগ্যাকাশে নতুন তারার উদয় হল। অর্থাৎ কি না মেরীর বাবা আগাথাকে খুবই পছন্দ করেন। জীবনের লটারীতে সব চেয়ে কুরূপা মেয়ের ভাগ্যেই দেখছি সব চেয়ে ভাল প্রাইজটা জুটে যায়। নিজের সংসারেই ত কত দেখলাম। জীবনের ধারাই এই রকম। কে জানে হয়ত মাদাম আগাথার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে—মেরীর বাবাও লাভ-লোকসানের খতিয়ানে একেবারে হেরে যাবেন না। আগাথা তাঁর প্রিয় পাত্রী। আর বাড়িতে গিন্নীর অভাবে একজন মেয়ে ছেলেরও দরকার। আগাথাই এত দিন এ সংসারের কাণ্ডারী ছিল। বদলের মধ্যে এর পর থেকে আর আগাথাকে মাস মাইনে গুণতে হবে না। ব্যবস্থাটা খুব খারাপ হবে না মেরীর বাবার পক্ষে। আর বুড়ো কাঁর্রাঁকে যদি একবার পার করে দিতে পারেন তবে ত বেলমঁৎ জমিদারীও একেবারে তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তাছাড়া এ স্বপ্ন আগাথারও প্রিয় স্বপ্ন···কিন্তু ঐ মেয়েটার চেহারার দিকে তাকালে কেমন যেন একটা সন্দেহের কাঁটা মনে খচ-খচ করে। কে জানে তলে তলে অন্য কিছু চলছে কি না, আমরা উপর থেকে যার আঁচ পাচ্ছি না।'

গ্লাসটি নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঠোঁট মুছে পার্শ্ববর্তিনীর কানে আবার ফিস-ফিস করে বললেন—'আচ্ছা মেয়েটার গোপন রহস্য কি জানেন কিছু?'

পার্শ্ববর্তিনী তেমনি নীচু গলায় উদ্গত হাসি চেপে উত্তর দিলেন

—'হয়ত এ অনুশোচনা। মেরীর মাকে আগাথা হয়ত বিষ খাইয়ে মেরেও ফেলতে পারে।'

—'এ নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। চেয়ে দেখুন মেয়েটার দিকে। একটা কণাও বোধ হয় দাঁত দিয়ে কাটেনি। আমার ত মনে হয় মেরী কি মেরীর বাবার প্রাণে আগাথার মত এমন গভীর ভাবে এ শোক বাজেনি।'

নীচে যখন এই আহার-পর্ব চলছে উপর তলায় মেরীর বাবা কতকগুলো খোলা ড্রয়ার সামনে নিয়ে বসে নানা দলিলপত্র সাজিয়ে রাখছিলেন।

নীচে হলঘর থেকে বহু কণ্ঠের চাপা কথাবার্তার গুঞ্জন আর কাঁটা-চামচ-ডিসের বিচিত্র শব্দঝঙ্কার ভেসে আসছে। ঘর-সংসার নতুন করে ঢেলে সাজাতে মৃত্যুর জুড়ি আর দ্বিতীয়টি নেই। 'আচ্ছা সেই কনট্রাকটার কি হল? ওটার ত আর কিছুই করা হয়নি।' ভাবতে বসেন মেরীর বাবা। অনেক দিন পর নির্ভর ছিলেন। অলস জীবন কাটিয়ে কাটিয়ে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বেশীক্ষণ কোন কিছু নিয়ে ভাবতে পারেন না।

মেয়ে মেরী বাবার সামনে একটি নীচু পা-ওয়ালা চেয়ারে বসে। পাতলা জামার নীচে দুটি পূর্ণকুম্ভের মধ্যিখানে চিঠিটা গোপন করে রেখেছে মেরী। সেই গোপনীয়তার একটা মধুর যন্ত্রণা ক্ষণে ক্ষণে উপভোগ করছে সে। চিঠি আর পড়বার দরকার নেই—চিঠির প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি কথা তার অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। গিল্‌স লিখেছে —'নিরীহ মাছির মত নিকোলাস একটা মাকড়সার জালে আটকে পড়েছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্যে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করাই বোধ হয় উচিত ছিল আমার। তবে বরাত ভাল যে মাকড়সাটার জাল ছিঁড়ে গেছে। আর যে মাকড়সার জালই ছিঁড়ে

গেল, তারও ত কাজ ফুরোল। তাকে পায়ের তলায় এমনি করে পিষে মেরে ফেলাই উচিত। যাই হোক, তোমাদের ঐ আগাথা সম্বন্ধে খুব সতর্ক, সাবধান থাকবে তুমি। এখনো দু'-এক দিন আমাদের একটু সামলে থাকা উচিত। নিজেদের সুখের জন্যে এখন আমোদ-আহ্লাদে মেতে আত্মহারা হওয়া আমাদের উচিত নয়। তোমার মায়ের স্মৃতির প্রতি আমাদের যথাকর্তব্য সম্মান দেখাতেই হবে। কিন্তু এ ক'দিন তোমায় না দেখে কেমন করে থাকব জানি না। অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ হতে বাধা নেই, যদি আমরা সংযম হারিয়ে না ফেলি। তুমি না আমি, আমাদের মধ্যে কে যে বেশী দুর্বল জানি না। কাছে পাব তোমায় অথচ আদর না করে থাকব কি করে ভেবে পাই না।

···শোন, আমি একটা ব্যবস্থা মনে মনে এঁটে রেখেছি। খাওয়ার পর চলে এসো না আজ নদীর দিকে—তোমাদের উঠোনের দেওয়ালের পাশে টিউলিপের ছায়ায় নয়—চলে আসবে সোজা নদীর ধারে যেখানে কাঠুরিয়ারা এলডার গাছ কেটে বড়ো বড়ো গুঁড়িগুলো ফেলে রেখেছে। কোথায় যাচ্ছ কারোর কাছে গোপন করার দরকার নেই। শুধু ভাল করে গায়ে জামা জড়িয়ে এস।

আমি থাকব বিরহ-নদীর ওপারে। কোথায় আছি একটা মশাল জ্বেলে তাও তোমায় সংকেত করব। তোমার সিগারেটের আগুন ঠিক দেখতে পাব আমি। সাদা উলের কোটটাই গায়ে পরে এস। তাহলে অন্ধকারেও আমার মনের মানুষকে ঠিক চিনে নিতে পারব।'

চোখের ওপর গিলসের চিঠিখানি ভাসছিল। উন্মনা হয়ে বসেছিল মেরী। বাবা কি বলছেন কিছুই কানে যাচ্ছিল না তার। হঠাৎ শুনলে বাবা বলছেন—

—'তোমার মায়ের কোন্ কোন্ জামা-কাপড় নিজের জন্যে রাখতে চাও আগাথার সঙ্গে কথা কয়ে নিও মা মেরী। বাকিগুলো কোন অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব আমি।'

মেয়ে যে তার কথায় কান দিচ্ছে না, তা লক্ষ্য পড়তেই হঠাৎ অধীর হয়ে উঠলেন তিনি। রাগ করে বললেন—'আমার কথায় তুমি কান দিচ্ছ না মেরী।'

—'আমি ও সবের একটাও রাখতে চাইনা বাবা। মাদাম আগাথার হয়ত ওগুলো কাজে লাগতে পারে।'

মেরীর চোখে কেমন একটা দুষ্টুমি-ভরা হাসির আলো চিকচিক করতে লাগল।

—'তোমার কাজে লাগবে না—আগাথার লাগবে মানে ?'

সাড়া না দিয়েই আগাথা ঘরে ঢুকে পড়েছে দেখে কথার মাঝপথেই থেমে গেলেন মেরীর বাবা। আগাথাকে যেন সদ্য কবর থেকে উঠে আসা প্রেতিনীর মত দেখাচ্ছে। কেন দেখাচ্ছে তাও ভাল করে জানে মেরী। কিন্তু বাবা কি ভাবছেন তা ঠিক ঠাহর হল না মেরীর।

—'এ আর আমি একটি মুহূর্ত সহ্য করতে পারছি না'—ঘরে ঢুকে বললে আগাথা—'কয়েক মিনিটের জন্যে একটু বাইরে যাও ত মেরী—তোমার বাবার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব আমি।'

—'বাইরে যাব কেন? কি এমন কথা যা আমার সামনে বলতে পার না বাবাকে? অন্তত আজকের দিনে আমি বাবার পাশে থাকব—বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না—'

—'অসভ্যতা করো না মা'—বললেন বাবা।

কিন্তু মেয়েকে ঘর থেকে চলে যেতেও বলতে পারলেন না তিনি। মেরীর কথায় আগাথাও বিন্দুমাত্র বীতরাগের ভাব দেখালে না।

মায়ের টাকাকড়ির হিসেব মেলাতে মেরী বাবার পাশে বসল যখন তার মুখে এতটুকু বিচ্যুতির চিহ্ন দেখতে পেল না মেরী। এতটুকু নড়েও বসল না সে। তেমনি স্থাণুর মত বসে রইল নিজের আসনটিতে। হাঁটু জোড়া করে টান-টান হয়ে বসে রইল। বুকের ভাঁজে যে চিঠির কাগজখানি লুকিয়ে রেখেছে সে তার জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নেই তার মনে। সেই কাগজের পাতলা ধারগুলো লেগে কেমন সর-সর করছে বুকটা। যেন একটা গোপন ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে তাকে সুখে রোমাঞ্চিত করছে হচ্ছে যা কাউকে বলতে পারা যায় না।

নীচের থেকে ভেসে আসছে নানা কণ্ঠের বিচিত্র কলরোল। হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে একটা হাসির হুল্লোড় উঠেই আবার খাদে নেমে গেল। তার পর একটা বক্তৃতার একটানা গম-গম আওয়াজ আসতে লাগল ওপরে।

ওপরের ঘর থেকে তিন জনই শুনতে পেল নীচের অতিথিদের উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তা। চেয়ার সরানোর ঘড়-ঘড় আওয়াজ। যাবার আগে সবাই একসঙ্গে কথা কইছে। একটু পরে সারা বাড়ি চুপচাপ হয়ে গেল। মেরী এতক্ষণ আগাথার মুখের উপর থেকে একটি বারও চোখ সরায়নি। আগাথার হালচাল বুঝে নেবার কোন অভিসন্ধি নয় তার। নিজের মনের দুর্বলতা না ধরা পড়ে সেই জন্যই এই সতর্কতা। কোথায় অলক্ষ্যে কে যেন তার ভবিষ্যতের ওপর হাত বাড়াচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের ভাগ্যকে জয় করে নিতে হবে তাকে। হতে হবে বীর্যশুল্কা। হতে হবে প্রেমে অশঙ্কিনী। তবু একটা অপরিসীম লজ্জায় তার মন অভিভূত হয়ে রয়েছে।

মা আজ নেই। মা কোন দিনই গিল্সকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন

না—হয়ত বা ঘৃণাই করতেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাদের দু'জনের মিলনের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতেন। মায়ের সম্বন্ধে এ কি ঘৃণ্য চিন্তা করছে সে। মনে হতেই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা হল তার। ভগবানের কাছে মায়ের আত্মার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করতে লাগল মেরী। 'মায়ের দোষ দেখছি তার জন্যে ক্ষমা কোরো আমায় ভগবান! সর্বজ্ঞ তুমি। তুমি ত জান মাকে আমি কত ভাল বাসতাম। মা মারা যেতে আমার মন কতখানি ভেঙে গেছে।'

মাতৃস্নেহের রৌদ্রময় দিনগুলিতে মনকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল মেরী যখন সে মাকে ছেড়ে থাকতে পারত না।

এক দণ্ডও চোখের আড়াল করতে পারত না তাকে। মায়ের মুখে ত লেগেই ছিল নিত্য অনুযোগ—'মেয়েটা সব সময় আমার আঁচল ধরে থাকবে।'

মাকে ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখতে পারে না মেয়েটা, একথা কে না বলত! তার সেই অত আদরের মাকে গোলাপের মালা দিয়ে হাত বেঁধে দিলে ওরা। থুতনির কাছটায় পুরু ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে কফিনে শুইয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে চিরকালের জন্যে চাপা দিয়ে দিলে মাটির তলায়।

আর তার গিল্‌স? মুখে তার একটুও মমতা নেই, মমতা দেখাতেও সে জানে না। কথায় তার এক ফোঁটা মধু নেই। দীর্ঘায়ত যার দুটি কালো চোখ মনে হয় পাথর থেকে কুঁদে তৈরী করেছেন ভগবান। সেই গিল্‌সও তার কাছে এলে কত কোমল হয়ে যায়। মেরীর দিকে চেয়ে থাকে সে, আর এক অপার রহস্যের শিখা থরথর করে কাঁপতে থাকে সেই চোখে। তখন আর পাথর মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা পাহাড়ের গা কুয়াশায় ভিজে উঠেছে।

একদিন রাত্রে ঐ চোখের এক ফোঁটা জলে সমুদ্রের স্বাদ

পেয়েছিল মেরী। গিল্‌স বলে, সে কখনো কাঁদে না। তবে কাঁদছে কেন আজ? তার জবাবে গিল্‌স বলেছিল—'তোমার ভালবাসার আনন্দে কাঁদছি মেরী। নইলে চোখে আমার জল আসতে জানে না।'

ঐ ক'টি কথা বলেছিল সে। অতখানি ভালবাসা মেরী কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। তার গিল্‌স বলেছে—'তোমায় ভালবাসি বলেই আমি কাঁদি।'

॥ ১৯ ॥

—'একথা তোমার মনে হয়নি যে, মেয়ে তোমার সেই ছোকরার সঙ্গে অভিনয় করতে যেতে পারে?'

মেরীর বাবা নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন দেখে আগাথা বিস্মিত হল। তবু কথাটা জুড়িয়ে যেতে দিলে না সে। বললে—'তবে কোথায় যেতে পারে ভাব তুমি? বল, আর কোথায়?'

নিজের অপার অজ্ঞতা ঢাকবার কোন চেষ্টাই নেই মানুষটার। একটু কাঁধ দুলিয়ে ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন—'তা বলে সে ছেলেটার সঙ্গে যে আজ যায়নি তা নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি। ওর মায়ের আজ শেষকৃত্য হল। আজকে সন্ধ্যায় আমার মেয়ে কোন অসৎ আচরণ করতে পারে তা আমি বিশ্বাস করতেই পারি না।'

দু'জনে খাওয়ার টেবিলে নিরিবিলি কথা হচ্ছিল। অপরিচিত লোক হঠাৎ দেখলে সহজে ভাবতে পারে যে, ওরা দুটিতে বহুদিনের বিবাহিত দম্পতী। খাবার সময় কোন কথা হয়নি দু'জনের। এখন সব গুছিয়ে নিতে নিতে আগাথা কথাটা পাড়লে।

—'এসো না আমার সঙ্গে বাঁধের কাছে। ওখানে ঐ টিউলিপ গাছের নীচে তোমার জোড় মাণিককে দেখিয়ে দি।'

পুরো এক গেলাস মদ গিলে নিয়ে যেন কত অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়ালেন মেরীর বাবা।

—'না, না তা হতেই পারে না।' বললেন উঠতে উঠতে—'আর ও-সব আমার না জানাই ভাল।'

—'আর আমি যদি এসে বলি যে দু'জনকে আমি হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি, বিশ্বাস করবে ত আমার কথায়? বলো, করবে ত বিশ্বাস?'

এ কথায় সাড়া দিলেন না তিনি। মৌন মুখে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আজকের রাতটুক বড়ো গুমোট-গরম। জানলার শার্সিগুলো খুলতে পারলে একটু আরাম হত। কিন্তু সে হবার নয়। যে বাড়িতে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সেখানে এত তাড়াতাড়ি শোকের চিহ্ন সরিয়ে ফেললে ভারী অশোভন ঠেকবে লোকের চোখে। সারা বাড়ির এই নিঝুম নীরবতা সহ্য হচ্ছিল না, তাই কথা কইছিলেন আগাথার সঙ্গে। নইলে কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার।

আগাথা জানে, এই লোকটার কাছে তার কিছুই গোপন নেই। কথায় কথায় সেই প্রিয় নামটি কত বার সে উচ্চারণ করেছে এর কাছে। সেই হতশ্রী ছোকরার সঙ্গে তার সব গোপন মিলনের খবর জানে এই লোকটা। যে নোংরা প্রাণীটা তার সমস্ত জীবনের উপর একটা অমার্জনীয় দাগ রেখে দিয়ে গেল।

হলঘর অবধি ভারী মন্থর পায়ে এলেন মেরীর বাবা। আর এগোলেন না। সেখান থেকে ভারী কোটটা কাঁধের ওপর তুলে নিলে আগাথা।

মেরীর বাবার দিকে চেয়ে ব্যগ্র জেদী কণ্ঠে বললে—'যদি ধরতে পারি তাদের দু'জনকে, বলো বিশ্বাস করবে কি না আমার মুখের কথা?'

এ কথারও কোন জবাব পেলে না দেখে কাচের দরজাটা সশব্দে আক্রোশে বন্ধ করে দিলে আগাথা। তারপর বাইরের আধ-অন্ধকার সমুদ্র-মন্থন করতে অদৃশ্য হল।

ঠিক বলেছে মেরীর বাবা। ঘরের বাইরেও আজ হাওয়ার লেশ নেই। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর অবধি সাদা কাঁকরের পথটা ম্লান জ্যোৎস্নালোকে পড়ে আছে। যেন আকাশের দুগ্ধ-শুভ্র ছায়াপথের একটা অংশ মাটির পৃথিবীতেও বিস্তৃত হয়ে এসেছে। এই রাত্রির নক্ষত্র-স্পন্দিত আকাশের নীচে একটা পূর্ণ জোয়ারের প্লাবনে আর একবার জেগে উঠেছে মগ্ন জাহাজটা। কুয়াশা আর গৃহছাদের উপরে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গীর্জার চূড়া। এই মনোরম রাত্রির পটভূমিকার ছায়াচ্ছন্ন একটি নিভৃত আশ্রয়ে দুটি তরুণ প্রাণের বিমুগ্ধ যৌবন কী অধীর আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে তা স্মরণ করা মাত্রই আগাথার রক্তে শিহরণ লাগল। সেই আনন্দের স্বর্গে হানা দেবে সে—পূর্ণতার ভাণ্ডারে করবে চোরা-ডাকাতি। ওখানে ছায়া যত নিবিড়, রস যত গভীর, মিলন যত মধুর, ততোধিক অসূয়া এই মেয়েটির মনে।

অত কাছে যাওয়া অবধি সেই ছায়ায় কোন হঠাৎ-সাড়া পেলে না আগাথা। ভাবলে, হয়ত বা অভিসারী ঐ দুটি নরনারী বিমুগ্ধতায় স্থান কাল পাত্র ভুলে বসে আছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন উন্মনা হয়ে গেল আগাথা।

ভাবলে কেন এল সে? এই অন্ধকারে হোঁচট খেতে কেন সে এল? ভাবলে আগাথা। এর চেয়ে ঐ প্রোজ্জ্বল আলোয় ঘরের ভিতর বসে থাকাই তার ভাল ছিল। ঐ নির্জন ঘরে একটি অলস বিগত-যৌবন পুরুষের কামনার ধন হয়ে বসে থাকাই বোধ হয় তার ভাল ছিল। মনে মনে শত কামনা করেও যে পুরুষ একটি বার সাহস করে হাত বাড়ায়

না। রূপময়ী সেই নির্জন রাত্রির তলায় হঠাৎ যেন মায়ামুগ্ধ হল আগাথা। ভাবলে থাকনা মুগ্ধ রাত্রির মুহূর্ত কটি ওদের দেবতার দান। জীবন যখন ফুরিয়ে যাবে, মৃত্যু এসে দাঁড়াবে শিয়রে, তখনও এই দুটি প্রাণ এই রাত্রির মধুর স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত হয়ে দেবতাকে শত বার প্রণাম করবে। বলবে—তোমার অপার করুণা ঈশ্বর—জীবনে এত আনন্দ পেয়েছি।

একবার ইতস্তত করলে আগাথা। কিন্তু তার প্রবৃত্তিরই জিত হল। বন্য পশুর মত অন্ধ আবেগে সে তার প্রবৃত্তির পথে ছুটে গিয়েছে চিরকাল—পথের কোন বাধা কখনো চোখ চেয়ে দেখেও নিরস্ত হয়নি। কিন্তু আজ আগাথার মনে কোন মিথ্যা মোহ ছিল না। বিজয়িনী হবার স্পর্ধা ছিল না মনে।

টিউলিপ গাছের কাছ বরাবর এসে দাঁড়াল আগাথা। শাখায় শাখায় পাতাদের মৃদু স্পন্দিত মর্মর। যেন নিশীথিনীর নিশ্বাসে শিহরিত হচ্ছে প্রকৃতি।

ঘাসের মখমলের ওপর আজ আর কাউকে চোখে পড়ল না আগাথার। তবে কি আজ তারা অন্য কোথায় অভিসারে গেল?

—'আমায় খুঁজছ না কি মাদাম?'

একটা পরিহাস-তরল কণ্ঠে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে আগাথা।

'আমায় দেখতে পাচ্ছ না মাদাম? তোমায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। এই যে আমি এখানে, এই এলডার গাছগুলোর কাছে।'

মেরী তাকে দেখে ফেলবার আগে যদি পালিয়ে যেতে পারত, ত অনেক লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত আগাথা। কিন্তু, তা হবার নয়। অপরের সুখ লুকিয়ে দেখতে চাওয়াই তার স্বভাব—অপরের সুখে কাঁটা না দিতে পারলে মনে তৃপ্তি পায় না আগাথা।

—'এই যে মাদাম—এই যে গুঁড়ির ওপর বসে আছি আমি।'

একলা মেয়েটাকে এতক্ষণে দেখতে পেলে আগাথা। বসে আছে যেন বিরহিণী হরিণী। আপন গন্ধের ইংগিত পাঠিয়ে দিয়েছে বনের হাওয়ায়। যে গন্ধের পথ ধরে আসবে বনমৃগ মধুর রভসের লোভে।

—'আমার পাশে এসে বসো মাদাম।'

—'কি ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে নদীর দিক থেকে। তুমি দেখছি ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবে।'

—'ঠাণ্ডা আবার কোথায়? ঐ আগুনে শরীর আমার তেতে রয়েছে।'

—'আগুন? আগুন আবার কোথায়?'

—'ঐ ত। নদীর ওপারে।'

ওপারে তাকিয়ে দেখলে আগাথা। নিভন্ত আগুনের শেষ শিখা ক'টি দপ করে জ্বলে উঠে প্রায় নিবে গেল। আবার তখনি নতুন শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

—'অত দূর থেকে গায়ে কখনো আগুনের তাত লাগে? তোমার গায়ের তাপ পাচ্ছি গা ঠেকিয়ে।'

এই মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভরা যৌবনের ঝলকানি সহ্য করতে পারে না আগাথা।

নিজের দিকে তাকিয়ে হিংসায় তার গা জ্বলে যায়।

আর একটা কথাও কইলে না মেরী। মেয়েটা যেন এক ফোঁটা নির্বোধ শিশু। শিশুর মতই হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন দিয়ে অন্ধকারে কত রকম ভঙ্গী করেছ মেয়েটা। প্রথমে কিছু না বুঝলেও বুঝতে দেরী হল না আগাথার। যতটা বোকা অর্বাচীন ভেবেছিল তাকে, তত বোকা নয় মেরী। ওপারে একটা জ্বলন্ত শাখা নাড়ছে কে। ওপারের ঐ নির্বাপিত আগুন আর ম্লান আভায়

রেখায়িত শরীরটা কার তা দেখতে না পেলেও বুঝতে বাকি রইল না আগাথার। জ্বলন্ত শাখার ঝলকানির চেয়ে দ্যুতিময় ঐ ছেলেটির শরীর। পাখির মাথার ঝুঁটির মত আগুনটা হঠাৎ ঊর্ধ্ববাহুতে জ্বলে উঠতেই চকিতের জন্য যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে আগাথা। প্রাণের নিরুদ্ধ উল্লাসে দুটি হাত একবার এপারের দিকে প্রসারিত করলে গিল্‌স। তারপর একটা অন্ধকারের প্লাবনে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

একটা অচিন্ত্য অনুভূতির আচম্বিত ধাক্কায় যেন জেগে উঠল আগাথা। তবে কি এমনি করে শোকের রজনী যাপন করছে তারা? ইচ্ছা করে রচনা করছে এই বিরহ? আজকের এই শোকের রাত্রে তাদের দু'জনের ব্যগ্র মিলনের মাঝখানে এই খরস্রোতা ধারা। বয়ে যাচ্ছে দারুণ বিরহের নদী মর্মরিত কাশবনে। কঠিন উপলে কল-কাকলিত। তবু এই বিরহের পটভূমিকায় আজকের মত এমন নিবিড় করে আর কোন দিন তারা পায়নি দুজনে দুজনকে। ঐ নক্ষত্র খচিত আকাশ, এই বৃক্ষলতা, সেই অবাঙ মানস গোচর দৃষ্টিসত্তা, তাদের সমস্ত পিতৃ-পিতামহ পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি—সকলের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন এমন প্রাণে প্রাণে আর কোন দিন বোধ করেনি তারা।

যেন একটা ভয়ার্ত প্রাণী ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরাল দিয়ে পালিয়ে গেল, এমনিভাবে ডালপালার শব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল মেরী। দেখলে তার মাদাম আগাথার চিহ্ন মাত্র নেই।

ড্রয়িং-রুমে ফিরে এসে আগাথা দেখলে, মেরীর বাবা সেইখানেই স্থাণু হয়ে বসে আছেন। যেখানে তাকে রেখে দিয়ে গিয়েছিল সে। বসে বসে একটি সিগার খাচ্ছেন। তার নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে একটা পচা তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে

নির্বিকল্প মুখে বসে কিসের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন মানুষটি, তাই একবার ভাবলে আগাথা। কিন্তু মুখ তুললেন না তিনি। চোখের ঘামে ভেজা ভারী পাতাগুলো অবধি নড়ল না যেন, এমনি সমাহিত ভাব। আগাথা ঘরে এসেছে। এখন তার দিকে চোখ তুলে তাকানো চলবে না, তা জানেন বলেই বোধ করি অমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

তার কাছে না বসে আগাথা যদি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয় তাতে কি আপত্তি আছে ওর? একবার জিজ্ঞাসাও করলে আগাথা। বড়ো ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

—'মেরীর সঙ্গে দেখা হল?'

মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালে আগাথা।

—'একা ছিল?'

উত্তর দিতে ক'বার ইতস্তত করলে আগাথা। যা দেখে এল নিজের চোখে তার যদি সত্য বিবরণ দেয় সে, তবে ত ঐ দুটি ছেলে-মেয়ের অপরিসীম প্রশংসাই করে ফেলবে সে। তাই যেন অনেকটা মোহাচ্ছন্নের মতই জবাব দিলে।

—'একলাও বলতে পার। আবার একলা নাও বলতে পার।'

উত্তর শুনে মেরীর বাবা তেমনি চুপ করে বসে রইলেন। এই মেয়েটিকে চাপ দিয়ে ও বিষয়ে কিছু জানতে চাইবার ঔৎসুক্য রইল না। অনেকক্ষণ পরে যখন কথা কইলেন যেন কত ক্লান্ত মৃদু স্বরে বললেন—'যা অবস্থা হল, তাতে মনে হয় আমাদের দুজনের—'

দরজার চাবি ঘোরাতে যাচ্ছিল আগাথা। এ কথা শুনে সেই অবস্থাতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বললে—'ঐ ছোকরার সঙ্গে নিজের মেয়েকে এই ভাবে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছে নাকি তোমার? কথার সুরে যেন তাই বোধ হচ্ছে।'

আর কোন সাড়া দিলেন না তিনি। তখন আগাথার পালা পড়ল। অনেক রকম করে আগাথা তাকে বোঝাতে লাগল। এরই মধ্যে তাড়াতাড়ি করা কি লোকচক্ষে ভাল দেখাবে? এখনো অবধি অশৌচ কাটেনি। সদ্য মৃতার কবরের মাটি ত এখনো তাদের চোখের জলে নরম হয়ে রয়েছে।

সদ্যবিরহী স্বামী স্ত্রীর নামোল্লেখ শুনে হাত তুলে আগাথাকে নিবারণ করলেন। বললেন—'আমার জুলিয়া। আহা, জুলিয়ার কথা আর আমায় মনে করিয়ে দিও না আগাথা! তার ত কাজ ফুরোল। সে ত শান্তিতে ঘুমিয়েছে। কিন্তু আমাদের ত মুক্তি নেই। আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করতেই হবে। কালই ত ডাক্তার সঁালো বলছিলেন আমায়—'যা করতে চান মঁসিয়ে দুবের্নে, সদ্যসদ্যই সেরে ফেলা ভাল। তাই নয় কি?' লোকটির চোখ দেখে ওর মনের ভাবনার কিছুটা আঁচ পেলাম যেন।'

শুনে আগাথা শুধু অসহিষ্ণুর মত কাঁধ দুটোকে একটু নাড়া দিলে। ডাক্তার সঁালো কেমন মানুষ, তার ধারণা কি, তা জানতে আর বাকি নেই।

কিন্তু মেরীর বাবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন না। বললেন—'ভারী সাবধানী আদর্শবাদী মানুষ ঐ ডাক্তার। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ওর দ্বিধার অন্ত নেই। তবুও এ শহরে ওর মত লোক আর একটিও নেই যাকে বিশ্বাস করে নির্ভর করা যায়, তা আমি হলপ করে বলতে পারি। সারা দুনিয়ায় ওরা সংখ্যায় নগণ্য। বিধাতা যেন এক মুঠো বিশ্বাসী মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই খুঁজে পেতে চিনে নিতে কষ্ট হয়। মনুষ্য জাতির ওপর তোমার ত ঘৃণার অবধি নেই আগাথা! কিন্তু কথাটা কি জানো, কখনো কখনো মানুষকে বিশ্বাস করতেই হয়। না করলে চলে না।'

যেন অনেকটা অভ্যাসের বশেই আবেগ-প্রবণ বাক্যস্রোত মাঝ-পথে সামলে নিলেন। স্বামীর এই ধরণের ভাব-প্রবাহে আচমকা অন্য কথার ঢিল ফেলে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করার নেশা ছিল স্ত্রীর। এ দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। মনে পড়তেই আকাশচারী ভাবনাকে গুটিয়ে নিলেন দুর্বেণে। যেন দু'কান ভরে শুনতে পেলেন স্ত্রীর সেই তীক্ষ্ণ অনুযোগ—'শিকারে যাওয়ার কোটটা ধোপার বাড়িতে দেবার কথা দিব্যি ভুলে বসে আছ ত? বেশ হয়েছে।'

মনে পড়ল সেই নিত্য অনুযোগী কণ্ঠ চিরকালের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর তার কথায় বাধা দেবার কেউ নেই। যত খুশি কথা বলতে পারেন তিনি। নিজেকে যেমন করে যতক্ষণ ধরে ব্যক্ত করতে পারেন, কেউ তাকে নিরস্ত পর্যন্ত করবার নেই। মনে পড়তেই সাহস হল। একটু যেন বিব্রত ভাবে আগাথাকে উদ্দেশ করে বললেন—'সত্ত-সত্তই ভাল, কি বল? ও দেরী করে লাভ কি?'

দরজার মুখ থেকে এতক্ষণে ঘরের ভিতর সরে এল আগাথা। বললে—'তাহলে ঐ বিয়ের কথাই তুলছ ত? আমিও তাহলে জিজ্ঞেস করি, ঐ ডাক্তার সাঁলোর ছেলেটার সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর রাখ কি দয়া করে? ও ছোকরা কেমন তার কোন স্পষ্ট ধারণা আছে।'

—'সে যেমনই হোক, আমার মা মেরী তাকে ভালবাসে এইটুকুই আমি খবর রাখি। ও বয়সের ছোকরাদের রকম এক। ওদের ভেতর আবার পছন্দ অপছন্দ?'

যেন কত গোপনীয় কি বলছে, এমনি ভাবে একেবারে ফিস-ফিস করে বললে আগাথা—

—'তুমি জান না তাই বলছ। ও ছেলেটা একেবারে অপছন্দের। আমি যে নিজে কিছু কিছু জানি ওর ব্যাপার-স্যাপারের।'

—'বল। কি জান বলো?'

দেওয়ালে হেলান দিয়ে খুব একটা কর্তৃত্বের ভাব দেখিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আগাথা। যেন নিজের মনঃশক্তির জোর দেখাবে এই লোকটার ওপর। গিল্‌সের সঙ্গে মেরীর বিয়ে হতে পারে, এ নিয়তির বিধানকে সে উলটে দিতে চায় নিজের ইচ্ছার জোরে। কিন্তু আগাথা জানে সে হারতে বসেছে। ভাগ্যের পাশা খেলায় ঘুঁটি যেমন চলেছে তাতে হার তার অনিবার্য। তবু সহজে ছাড়বার মেয়ে সে নয়।

—'কি বলে বোঝাব তোমায় সে-সব? জিনিসগুলো ভাল নয়, এই অবধি বলতে পারি—মানে ভারি খারাপ আর কি—।'

যে সব কথা বললে এই মানুষটার মন ভাঙবে, তা বলতে যেন আর জোর পাচ্ছে না আগাথা। তাই তার গলায় অবজ্ঞার চেয়ে ঔদাস্যের ভাব বেশী প্রকাশ পেল।

—'বলো না, কি সব?'

মানুষটা আজ যেন জিদ ধরে বসেছেন। না শুনে ছাড়বেন না।

শরীর-মন বড়ো অবসন্ন লাগে আগাথার। ক্লান্ত কপালের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে কোন রকমে সাদা গলায় বলতে চায়—'অবশ্য কোন প্রমাণ নেই আমার হাতে।'

ঐ অবধি বলেই থেমে যায়। আর সেই মুহূর্তে জীবনের চরম পরাজয়ের মুখোমুখী দাঁড়ায় আগাথা। চার পাশের ধোঁয়ার কুয়াশার মধ্যে বসে থাকা মানুষটি যেন নিশ্চল পাষাণ-স্তূপ। শুধু বয়সে কুঞ্চিত ভারী পাতার নীচে চোখের মণি দুটি তার জ্বল-জ্বল করতে থাকে। তাকে দেখে মস্ত কোলা ব্যাঙের কথা মনে পড়ে আগাথার।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে মেরীর থমকে থামার শব্দ পায় দু'জনে। পর মুহূর্তেই দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করে দেখা দেয় মেরী। ঘরের ভিতরে আগাথাকে বাবার সঙ্গে একলা দেখে তখুনি দরজা বন্ধ

করে দিল সে। মেরীর অপস্রিয়মান লঘু পায়ের ধ্বনি কান পেতে অনেকক্ষণ ধরে শোনে তার গভর্নেস মাদাম আগাথা।

—'এত দিনে আমার প্রয়োজন ফুরোল। এই সপ্তাহেই আমায় বিদায় দেবার ব্যবস্থা করে দাও তুমি।'

এতক্ষণে যেন সাড় এল মানুষটার। নড়ে-চড়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—'তুমি কি পাগল হলে আগাথা? এ তোমার কি খেয়াল?'

—'আমি নয়, পাগল হয়েছ তুমি। আমার যে ছাত্রী তার বিয়ে হয়ে গেলে, আমার আর এখানে পড়ে থাকার কোন্ যুক্তি থাকতে পারে?'

তার কথা শুনে ছাইদানিতে সিগারেটটা ফেলে রেখে থপ-থপ করে এগিয়ে এলেন তিনি আগাথার দিকে।

—'আজই জুলিয়ার শেষকৃত্য সেরে এসেছি আমরা। মনে আমার যা আছে তা আজ সন্ধ্যায় নাই বা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে তুমি আগাথা? আমি জানি, জুলিয়া আমার ইচ্ছাতেই সানন্দে সায় দেবে। জুলিয়ার মনে মনে ইচ্ছাও ছিল তাই। আমি কিসের কথা বলছি তা বুঝতে তোমার ভুল হবে না আগাথা। সে কথা তুমিও জান। তবু তোমাকে এটুকু আশ্বাস আমি দিয়ে রাখছি যে, তোমার জীবনের কোন বদল হবে না এ বাড়িতে। এমন কি, যদি তোমার তাই ইচ্ছে হয়, এখন যে-ঘরে থাকছ, শুচ্ছ, সেই ঘরেই থাকতে শুতে পারবে। আমি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করব না।'

একটি বার থেমে আরো নীচু গলায় বললেন—'তোমার কাছে কোন কিছুই দাবি করব না আমি। যত দিন না তুমি স্বেচ্ছায় নিজেকে তুলে দেবে, তত দিন তোমার গা অবধি ছোঁব না আমি, এই শপথ করছি তোমার কাছে। এখন যেমন আছ তখনও তেমনি সহজ ভাবে

থাকবে এ বাড়িতে। আমি কোন দাবি-দাওয়া করব না তোমার ওপর, যত দিন না তুমি ইচ্ছা করে আমার কিছুতে অধিকার চাও। তত দিন আমার মেয়ের মতই থাকবে তুমি—'

কথাটা শুনে একটা ডুকরে ওঠা কান্না আগাথার গলায় এসে আটকে গেল। যেদিন তার মুখের ওপর নিকোলাস বলেছিল—'তোমার কথা ভাবলে বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়', সেদিনও এমনি একটা কান্না পাথরের টুকরোর মত তার গলায় বেধে গিয়েছিল। তবু আজ সারা মন দিয়ে সে মেরীর বাবার কথায় না বলতে পারলে না। কোথায় যেন একটা নীরব সম্মতির ঝঙ্কার উঠতে লাগল। ভালই হল ভাবলে আগাথা। তবু ত একেবারে হার মানলে না সে—হল না পুরোপুরি নিষ্ফলা।

তার জীবনের যে পরাজয় হৃদয়ের রক্তে রাঙা তার কথা কেউ জানবে না। সবাই জানবে ডুবের্নেদের ঘরে ঐ কুৎসিত মেয়েটা সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল। এত দিন যে মেয়েটার গভর্নেস ছিল সে, এর পরে এই ঘরের ঘরণী হয়ে মাথা তুলে বেড়াতে পারবে আগাথা তার মায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে।

আজ রাতে যে মেয়েটা তাকে এমন করে পরিহাসে বিড়ম্বিত করলে তার জীবনের আগামী সব দিন-রাত্রির উপর একটা অশুভ গ্রহের মত ভর করে থাকবে আগাথা। তার সমস্ত সুখে কাঁটার মত বিঁধে থাকবে।

আগাথার উত্তর শোনার জন্যে পল পল করে সময় গুনছিলেন মেরীর বাবা। অনেকক্ষণ অবধি একটি আপত্তির ওজরও যখন শুনতে পেলেন না, তখন আরো সাহস সঞ্চয় করে বললেন—

—'এতক্ষণ যা বললাম তা মনে রাখার কোন দরকার নেই আগাথা। আমাদের দু'জনের অত তাড়াতাড়ি করার কোন তাগিদ

নেই। আমি চাই যে আমার কথায় সায় দেবার আগে সব দিক বেশ ভাল করে বিবেচনা করে দেখবে তুমি। হঠাৎ একটা উত্তর আমিও চাই না। মেরী মা'র বিয়ে হওয়া অবধি তোমাকে তার খুব প্রয়োজন হবে। তার খাওয়া-পরা এটা-ওটার ওপর তোমাকেই ত লক্ষ্য রাখতে হবে। তুমি হবে তার দেখা শুনার মানুষ। কথাটা কি জানো আগাথা, তোমার বয়সের মেয়ে মানুষরা যাকে সুখ বলে লোভ করে, আসল সুখ তা নয়। অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয় না যাদের, সংসারে তারাই সুখী। সমাজে মান-সম্মান নিয়ে বাস করতে পারাটাতেই সুখ—'

তার কথায় বাধা দিলে আগাথা। বললে—'কি ভুলো মন দেখেছ আমার—তোমার কথাটা এক দম ভুলে বসে আছি—'

আগাথার কথা শুনে বড়ো দুঃখে মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়ল দুবের্নের। তাঁর সংসারে আগাথা শুধু একটা শূন্য স্থানই পূর্ণ করছে না। কোন ফাঁকে সেই মৃতা মেয়ে মানুষটির স্বভাব-প্রকৃতি অবধি আগাথায় এসে বর্তিয়েছে।

আগাথা চলে যাবার পর আলোর ধারে গিয়ে বসলেন তিনি। একা একা কত কি ভাবলেন নিজের মনে। আঠাশ বছর বয়স হল। এ বয়সে কি আর পুত্র সন্তান হবার আশা আছে না কি? ডাক্তার সাঁলোর সঙ্গে একবার আলাপ করতে পারলে মন্দ হয় না। আবার ভাবলেন, কি দরকার আর ও সবের। জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে নিয়তির কাছে অঞ্জলি পেতে অতিরিক্ত কিছু পাবার লোভ না করাই ভাল। এ বয়সে আর ছেলের বাপ হওয়ার আশা করাই মিথ্যে।

ও সব চাওয়া-পাওয়ার থাক না হিসেব। ঠিক এই মুহূর্তে লোভের অঙ্কটাই কষে দেখলেন তিনি। বেলমঁৎ জমিদারীর মালিকানা

যার, সেই মেয়েকে বিয়ে করলে রাজত্ব রাজকন্যা দুই-ই তার মুষ্টিগত হবে।

সেই লোভের আগুনে দুটি চোখ ঝক-ঝক করতে লাগল।

॥ ২০ ॥

—'লোভ যে হয়নি তা বলব না বাছা'—সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই মা বলছিলেন নিকোলাসকে—'খুবই হয়েছিল লোভ, কিন্তু সেই লোভের বঁড়শী আমার গলায় আটকে ফেলতে পারেনি মেয়েটা।'

আগামী কাল সকালেই নিকোলাসের প্যারিসে যাবার কথা। ঘরের আলোর নীচেতেই খেতে বসেছিল সে। মা নিজে যত্ন করে তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে একটি বৌ নিয়ে আসবেন ঘরে আর সেই সঙ্গে মস্ত একটি জমিদারী আসবে তার সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাতে, মনের এই সযত্ন-সঞ্চিত আশা যে ভাবে খান খান হয়ে গেল, তাতে মায়ের মন যে ভেঙ্গে পড়েনি এই মস্ত বড়ো সান্ত্বনা রইল নিকোলাসের।

—'মেয়েটা আমার রান্নাঘরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই, মন আমার কু বুঝেছিল। ওর সব আশা ভেস্তে যাচ্ছে বলেই যে মেয়েটা ছুটতে ছুটতে এসেছে তা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। আমাদের মায়ে-ছেলের যে তাতে ভালই হল তাও ঠিক। হঠাৎ কি করে যে আমার চোখটা ফুটল ভেবে তুই নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছিস, না রে নিকোলাস? তোর মা বোধ হয় পাগলই হয়ে গিয়েছিল, নয়ত কি করে ভাবতে পেরেছিলাম যে, ঐ মেয়ে মানুষটার সঙ্গে সুখে ঘর করতে পারব ছেলেকে নিয়ে। আর শুধু কি তাই—ওর দয়ার অন্ন মুখে রুচত কি করে আমার? কিন্তু সেও সহ্য হত। কিন্তু তোর মত

ভাল মানুষ ছেলেকে ও ডাইনী এক হপ্তায় একেবারে গিলে খেয়ে ফেলত, সে আমি চোখ চেয়ে দেখতাম কি করে মা হয়ে? তোরও বাছা একটু শক্ত হওয়া উচিত ছিল। এক-একটা মেয়ে মানুষ আছে, পুরুষে ধাক্কা না দিলে যাদের চৈতন্য হয় না।'

আপন মনে ফিস-ফিস করে বললে নিকোলাস—'ধাক্কা দিতে আমিও কসুর করিনি মা। এমন কঠিন ধাক্কা দিয়েছি যা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।'

কিন্তু মার কান অবধি পৌঁছায় তেমন উঁচু গলায় বললে না নিকোলাস। ঐ তার মা। বুড়ো বয়সের চাল্‌সে-ধরা চোখের দৃষ্টি যতটুকু যায় ততটুকুই তার সংসার। সেই মাকে ছেলে হয়ে এর বেশী আর কি বলতে পারে নিকোলাস? সংসারে যারা তাকে ভালবাসলে তাদের দুই হাতে হৃদয়ের অমৃত ঢেলে দিয়েছে নিকোলাস। আর যারা তার ভিতরের স্নিগ্ধ মানুষটিকে বেদনায় শরবিদ্ধ করতে চায় তাদের দুঃখ না দিয়ে তার উপায় কি?

—'ভারি মুষড়ে পড়েছে নিশ্চয় মেয়েটা। গীর্জে থেকে যখন বেরিয়ে আসছিল, সাহস করে ওর দিকে তাকাতে পারিনি বটে, কিন্তু ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল একবার ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখি।'

ছেলের মুখোমুখী বসলেন মা। যত্ন করে ছেলের পনীর কেটে দিলেন।

শান্ত কণ্ঠে বললে নিকোলাস—'দু' চোখের জল শুকোতে ওর দেরী হবে না মা। দুবের্নেদের ঘরে বিয়ের কনে হয়ে ঢুকলেই—'

—'ও মা তাই নাকি?'—মার চোখে এক-জাহাজ বিস্ময় ভরে উঠল—'বলিস কি রে? দুবের্নে বুড়োকেই বিয়ে করবে মেয়েটা? তাও হতে পারে বটে, কথাটা তুই খুব মন্দ বলিসনি বাছা!'

—'সত্যি যদি ঐ বুড়োটাকে গাঁথতে পারে আগাথা ত একটা বারুদ-স্তূপ জ্বলতে বাকি থাকবে শুধু। এ আমি তোকে বলে দিলাম নিকোলাস। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কি জঘন্য খেলাটাই না খেললে মেয়েটা বল ত?'

—'কি আবার করবে ও? যাই করুক, আমাদের ভালো বই মন্দ হবে না মা।'

টেবিলের ওপর ছেলের হাতখানা আলগা থির ভাবে পড়ে আছে দেখলেন মা। ভালো হবে বৈ কি। তাঁর সংসারে সব ভালো হতেই হবে। ছেলের দিকে নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে মায়ের মনে কত ভাবনার তোলপাড় হতে লাগল। এক সময় বললেন—'ঐ সাঁলোদের ছেলেটার কথা ভাবছি আমি। মেরীর সঙ্গে গিল্সের বিয়েটা ভাঙ্গতে যদি না পারে ত ঐ মেয়েটা পথে চিরকাল কাঁটা হয়ে থাকবে। দোর গোড়ায় শত্রু নিয়ে ওকে ঘর করতে হবে।'

আপন মনে মাথা নাড়লে নিকোলাস।

—'তা আর পারবে না মা। বিয়ে ওদের নিয়তির বিধান। এতদিন পরে তা আর ওলটাতে পারবে না আগাথা। তবে ওদের দু'জনের প্রেম, ওদের ভালবাসার সংসার নষ্ট করে দিতে সারাজীবন চেষ্টার কসুর করবে না ও রকম মেয়ে।'

—'তুমি বাছা আর ও রকম ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে অশান্তি করো না মনে মনে।'

—'সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা। ও পথে আর আমি কোন দিনই হাঁটব না। তা তুমি দেখে নিয়ো।'

পকেটে হাত দিয়ে আলতো আঙ্গুলে চিঠিখানা স্পর্শ করলে নিকোলাস। দিনের বেলা গিল্স ওকে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্যারিসে যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলাটুকু বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে যেতে

পারবে না—মার্জনা চেয়েছে গিল্‌স। সে যেন কিছু মনে না করে। প্যারিসে দেখা ত হবেই শীগগির। কিছু বইপত্তর জামা-কাপড় তার সেখানে পড়ে আছে। প্যারিসে অবশ্য থাকতে যাবে না সে। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়েই ডোর্থে ফিরে আসবে সে সন্থ-সন্থ। জানুয়ারী মাসে তাদের বিয়ের তারিখ স্থির হয়েছে। বিয়ের পর মেরীকে নিয়ে তারা বালুজে সংসার পাতবে। তার মেরীরও ইচ্ছে তাই।

যেন স্বগত স্বরেই বললে নিকোলাস—'মানুষে আর পোকামাকড়ে বিভেদ বড়ো অল্পই দেখছি সংসারে।'

—'কি বললি ?'

—'গিল্‌স আর আমি—আমরা দু'জনেই গুটি থেকে বেরিয়ে পড়েছি মা।'

—'কি যে তুই এলোমেলো বকিস বাছা, মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারি না।'

আর কথা বাড়ালে না নিকোলাস। বাইরের ঐ তিমির রাত্রির কোলে মৌনমুখর আকাশ পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এল তার মনের জগতে। উঠে পড়ল নিকোলাস। হাত পেতে মার কাছে দরজার চাবিটা চাইলে সে।

—'কাল সকালে চলে যাবি, আজকের সন্ধ্যেটুকুও ঐ গিল্‌সের সঙ্গে না কাটালে চলে না তোর ? তার চেয়ে থাক না বাবা মায়ের কাছে।'

—'না মা না'—শুকনো গলায় বললে নিকোলাস—'গিল্‌স গেছে তার মেরীর কাছে। আমি একটু ফাঁকায় ঘুরে আনব একা-একা।'

—'তবে আর কি ? রাত গভীর হতে থাকবে। রোজকার মত বুড়ী মা জেগে শুয়ে থাকবে পথ চেয়ে।'

মায়ের মিনতি কানে তুললে না নিকোলাস। জেদী গলায় বললে—'চাবিটা দাও আমার হাতে।'

চিরকাল যেমন করে আসছেন আজও তেমনি ছেলের কথায় হাত নেড়ে অসম্মতি জানালেন মা। মায়ের এই বীতরাগের চেহারাটা অনেক দিনের জানা। তাই বুঝতেও দেরী হল না তার। টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে মায়ের মুখোমুখী দাঁড়াল নিকোলাস। দৃপ্ত পুরুষভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বললে—'কই দাও। দাও চাবিটা আমার হাতে। দেরী করছ কেন মা?'

অমন নরম ভালোমানুষ ছেলেটাকে হঠাৎ কত মস্ত দেখাচ্ছে। কত সরল ঋজু তেজীয়ান। তার সামনে ছেলের এই রকম মেজাজ আগে কখনো দেখেন নি মা। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁড়ালেন চেয়ারে হেলান দিয়ে।

বিড়-বিড় করে বললেন—'কি হল তোর আজকে? অমনি করে কি মায়ের সঙ্গে কথা কয় বাবা? তা ছাড়া চাবি তোর নয়—চাবি আমার।'

—'তোমার? তাই বুঝি ভেবে রেখেছ মনে মনে। তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, এ বাড়ি তোমার নয়—এ বাড়ি আমার।'

শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না মা। সমস্ত শরীরটা এলিয়ে আসতেই বসে পড়লেন চেয়ারে। ছেলের আপাদমস্তক বার বার করে খুঁজে দেখতে লাগলেন।

—'যা আমার পোড়া কপাল! তাই বুঝি? তাই বুঝি?'

—'কেন মিছিমিছি আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ মা?'

—'কোথায় যেন রাখলাম চাবিটা'—তবু যেন কত ইতস্তত করতে লাগলেন।

—'তোমার ঢিলে জামাটার পকেটে আছে দেখো।'

পকেটে হাত দিয়ে বার কয়েক হাতড়ালেন মা। তার পর চাবিটা বার করে যখন ছেলেকে দিলেন, থর-থর করে কাঁপতে লাগল শীর্ণ হাতখানা।

মায়ের হাত থেকে চাবিটা যেন ছিনিয়েই নিলে নিকোলাস।

দরজা অবধি মা তার পিছু পিছু এলেন। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন—'আটাশ বছর বয়েস হ'ল ছেলের, আর ত সেই ছোট্ট খোকাটি নেই আমার নিকোলাস। এখন সে মস্ত পুরুষ মানুষ। তা হোক—তবু বাইরে যাবার আগে বুড়ো মাকে একটা আদরের চুমু দিয়ে যাবি ত বাবা।'

মাথার উপর অন্ধকার নীল আকাশে দুগ্ধ-শুভ্র ছায়াপথ। সম্মুখে প্রসারিত দীর্ঘায়িত পথটিকে মনে হচ্ছে যেন আকাশের ছায়াপথেরই একটানা ধারা। আকাশ পৃথিবীর মধ্যে আজ কোথাও কোন ছেদ নেই, বিরতি নেই। নির্জন সেই পথে একাকী হেঁটে যাচ্ছে সে। কানে বাজছে নিজেরই পদধ্বনি। আকাশ পৃথিবী জোড়া নিস্তব্ধতার পটভূমিকায় সেই একটি ধ্বনিরই ওঠাপড়া। আজ এই নির্জনতায় কোন সঙ্গীর লোভ নেই তার। এমন কি গিল্‌সকেও তার মন চাইছে না। সম্পূর্ণ একা—একাকীই আজ নিজেকে ভালো লাগছে। কি একটা অস্ফুট অতৃপ্তি, গোপন পিপাসা সমস্ত হৃদয়কে তৃষিত করে তুলেছে। সারা পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য সাম্রাজ্যের অধিকারেও হৃদয়ের সেই তৃষ্ণা মিটবে না। এ তৃষ্ণায় বড়ো বেদনা। তবু এ তৃষ্ণা তার একান্ত আপনার।

কী এক অব্যক্ত করুণ মধুরতা, বিধুর মমতা সমস্ত অন্তরখানিকে

ভরে তুলেছে। নয়ানে বয়ানে তার যত পরিচয় ফুটে উঠেছে, সব আজ লোক-লোচনের অগোচর। তা দেখবার কেউ নেই এই নির্জন রাতের নিভৃত অবকাশে। বোধহীন হৃদয়হীন ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর নীচে যে বিপুল জলরাশি সমুদ্র শয়নে শুয়ে আছে, তারই মত বিপুল ব্যাপ্তিতে সমস্ত অন্তরখানি জুড়ে আছে সেই মধুর করুণা-সিন্ধু।

যতদূর দৃষ্টি চলে সমস্ত আকাশখানি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে পাইনের বন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সেই বনস্পতির ভিড়ে হঠাৎ একটা ফাঁক পড়ল। তারই পিছনে মস্ত একখানা আকাশের রূপ চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। মাথা ঘুরিয়ে তাকালে। তাকিয়ে দেখলে নীচু গৃহছাদের উপর জেগে-থাকা গীর্জাটির বিরাট অন্ধকার রূপ। যেন নীল সমুদ্রের চেয়ে নীল এক আকাশ-সমুদ্রের তটলগ্ন গতিহারা একখানি কৃষ্ণ ছবি। ঐ মস্ত আকাশের বিরাটত্বের কাছে মানুষ প্রাণীকে কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। তবু সেই তুচ্ছতাকে পরাভূত করে, সব সামান্যতাকে জয় করে মানুষ এক মহৎ স্বপ্নকে আকাশমুখী করে তুলে ধরেছে। যে মহান স্বর্গপ্রীতি তাদের হৃদয়কে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরিত করে, সেই সুন্দর ভালবাসাই ঐ গীর্জার রূপে রেখায় অবয়বে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিকোলাস সেই আকাশের নীচে। তার পর আবার সুরু করলে পথ চলা। লেরোর তীরে পৌছে সেই নিরিবিলি প্রাচীর-গাত্রে উঠে বসল সে।

বসল আর তার নবজন্ম হল। চেনা মানুষটা তার অচেনা হয়ে গেল। তার জানা সংসারে যেখানে যত প্রিয় পরিচিত মানুষ, তারা আর তার আপনার রইল না। বিশ্ব-জগতের গভীর বিস্তৃত

সমুদ্র-শয্যায় ঐ গীর্জার মতই দোসরহীন তার অস্তিত্ব থর-থর করতে লাগল।

মনে হল, ঐ নির্জনতায় কার সঙ্গে অভিসারে এসেছে তার হৃদয়। কিন্তু কে সে, তা তার প্রাণ-সত্তাই শুধু জানে, সেখানে আর কাউকেই সে জানে না, চায় না।

অনন্তের অভিসারী সে, অমৃতের ভিখারী।

সমাপ্ত